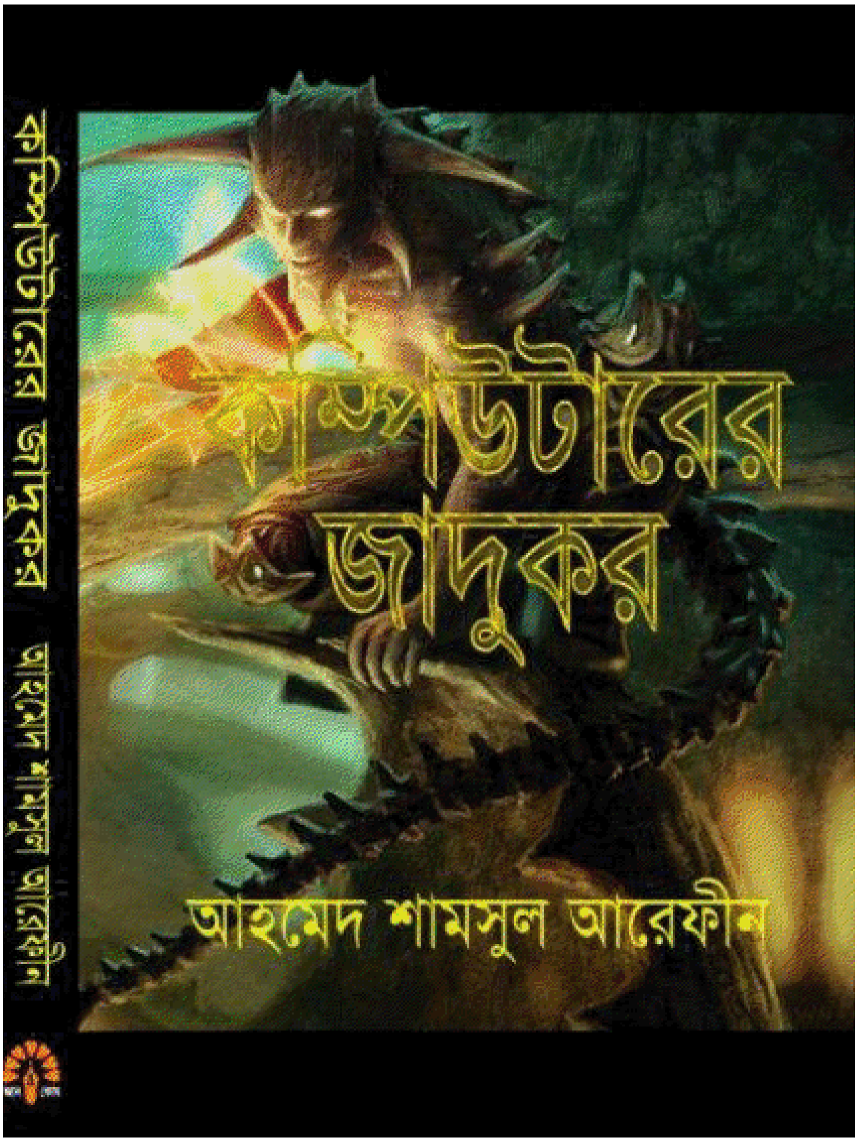

কম্পিউটারের জাদুকর

আহমেদ শামসুল আরেফীন

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী বইমেলা ২০০৯

কম্পিউটারের জাদুকর

আহমেদ শামসুল আরেফীন

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী বইমেলা ২০০৯

প্রকাশক
শাহীদ হাসান তরফদার
জ্ঞানকোষ প্রকাশনী
৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, ২য় তলা, ঢাকা-১১০০।
ফোন- ৭১১৮৪৪৩, ৮১১২৪৪১, ৮৬২৩২৫১

© লেখক

প্রচ্ছদের ছবি- হেলগেইটলন্ডন ডট কম হতে একটি গেইমের
ওয়ালপেপার অবলম্বনে

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ - লেখক
কম্পিউটার কম্পোজ- মুনীর আহমেদ

মূল্য - ১২৫/- (মুদ্রিত সংস্করণ)

মুদ্রণ
নোভা প্রেস এন্ড পাবলিকেশন
১৫/বি, মিরপুর রোড, ঢাকা।

জ্ঞানকোষ প্রকাশনী
৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, ২য় তলা, ঢাকা।
ফোন- ৭১১৮৪৪৩, ৮১১২৪৪১, ৮৬২৩২৫১

Computer er Jadukor by Ahmed Shamsul Arefin. Published by – Gyankosh Prokashoni 38/2-ka, Banglabazar, Dhaka-1100. Phone- 7118443, 8112441, 8623251

Printed Price: 125.00 Taka

উৎসর্গ

ইঞ্জিনিয়ার মুজাফর আলী

প্রিয় মানুষ, প্রিয় মেধাবী শিক্ষক (বুয়েট),
প্রিয় দাদু।

এমন কম্পিউটারকে কখনও বিশ্বাস করো না, যা তুমি জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলতে পারো না।
- স্টিভ ওজনিয়্যাক, অ্যাপল কম্পিউটারের আসল করিগর

অনলাইন সংস্করণের কথা

বাংলাদেশী মেধাবী কম্পিউটারবিদের কাহিনী নিয়ে অনলাইন সংস্করণ লেখার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সময়ের অভাবে পারলাম না। তাই আপাতত মূদ্রিত বইটিই ছোট করে অনলাইনে দেওয়া হলো। নতুন প্রজন্মকে কম্পিউটারের জাদুকরদের পরিচিত করে তোলাই এই বইয়ের একমাত্র প্রত্যাশা।

আরেফীন - নিউক্যাসল অস্ট্রেলিয়া, ২০১০।
asarefin@yahoo.com

মূদ্রিত সংস্করণের ভুমিকা

কম্পিউটারকে যদি জাদুর বাক্স বলা যায়, তবে কম্পিউটার নিয়ে যারা শৈল্পিক সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার ও থিওরী তৈরী করেছেন তাঁদেরও কি কম্পিউটারের জাদুকর বলা যায় না?

এই ভাবনা থেকেই সেরা কিছু কম্পিউটারবিদের জীবনকাহিনী তুলে ধরলাম। আরও অসংখ্য কম্পিউটারবিদ যুক্ত হচ্ছেন প্রতিনিয়ত। উইকিপিডিয়ায় তাঁদেরকে পাওয়া যাবে সহজেই। তারপরও কিছু কিছু দূর্লভ ছবি ও গল্প নিয়ে অসাধারন মেধাবী কিছু মানুষের কথা এখানে লিখলাম।

এই বইটি লেখার কাজ শেষ করার জন্য জোরাজুরি করা, উৎসাহ দেয়া এমনকি ভুল শোধরানোর কাজে সহায়তা করার জন্য সহধর্মিনী রেজওয়ানাকে ধন্যবাদ। অন্যথায় হয়তো বইটি আরও অনেকদিন কিংবা অসীম সময়ের জন্য অপ্রকাশিতই থাকতো।

ভবিষ্যতে আমাদের বাংলাদেশী অসংখ্য মেধাবী কম্পিউটারবিদের কাহিনীও আসবে এতে।

আহমেদ শামসুল আরেফীন
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ ইং

মানুষের নিয়ন্ত্রণ কম্পিউটারের হাতে তুলে দেওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে ?

গুগলের কারিগর: সার্গেই ব্রিন (Sergey Brin)

বিশ্বের প্রথম সারির সার্চ ইঞ্জিন গুগলের নাম কে না জানে। এই গুগলের পেছনে যারা কাজ করছেন তাদের মধ্যে অন্যতম একজন হলেন এই সার্গেই ব্রিন।

সার্গেই ব্রিনের জন্ম রাশিয়ার মস্কো শহরের এক ইহুদী পরিবারে। মাত্র ছয় বছর বয়সে পুরো পরিবার আমেরিকায় চলে আসে। সার্গেই ব্রিনের বাবা মিখাইল ছিলেন একজন গণিতবিদ, তিনি মেরীল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন।

মজার ব্যাপার হলো ব্রিনের মা ইউজেনিয়া ব্রিনও ছিলেন একজন গণিতবিদ এবং প্রকৌশলী। যিনি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র নাসাতে কর্মরত। এরকম বাবা-মায়ের সন্তান যে দারুন কোন কাজ করবে, তাতো খুবই স্বাভাবিক।

ছোটবেলা থেকেই ব্রিনের ছিল কম্পিউটারে প্রতি প্রবল আকর্ষণ। নয় বৎসর বয়সে তাঁর বাবা তাকে জন্মদিনের উপহার হিসেবে দিলেন কমোডর-৬৪ নামের একটি কম্পিউটার । গণিত এবং কম্পিউটার বিষয়ে তার প্রতিভা স্কুলের প্রথম দিনগুলোতেই প্রকাশ পেতে লাগলো।

১৯৯০ সালে ইলেনর রুজভেল্ট হাই স্কুল থেকে পাশ করে সার্গেই ব্রিন ভর্তি হলেন মেরীল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগে। ১৯৯৩ সালে অত্যন্ত ভাল ফলাফলের সাথে স্নাতক ডিগ্রী সম্পন্ন হলে ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশনের ফেলোশীপ নিয়ে স্নাতকোত্তর পড়াশুনার জন্য ভর্তি হলেন বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয় স্টানফোর্ডে।

১৯৯৫ সালের অগাস্ট মাসে তিনি তার স্নাতোকত্তোর পড়াশুনা শেষ করেন এবং যথারীতি পিএইচডির জন্য ভর্তি হলেন। কিন্তু আজ অবধি তাঁর গবেষণা শেষ না হওয়ার এবং গুগল কোম্পানীতে তাঁর বিসস্মৃত কর্ম পরিধির জন্য ডক্টরেট ডিগ্রী পাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তবে যাই হোক এমপ্রেসা ইনস্টিটিউট তাঁকে একটি অনাররী এমবিএ ডিগ্রী সম্মানিত করে।

স্ট্যানফোর্ডের কম্পিউটার সাইন্স ডিপার্টমেন্ট- গেইটস ভবন (বিল গেইটস এর নামে) এখানেই
পিএইচডি শেষ না করেই
চলে আসেন সার্গেই ব্রিন

সার্গেই যখন স্ট্যানফোর্ডে পড়ছিলেন, তখনই ইন্টানেটের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বাড়তে থাকে। ডাটা-মাইনিং এবং প্যাটার্ণ-এক্সট্রাকশনের উপর তিনি একাধিক পেপার লিখে ফেলেন। এর পাশাপাশি তিনি একটি সফটওয়্যার তৈরী করেন যা টেক্স (T_EX) ফরম্যাট লেখা বৈজ্ঞানিক গবেষণা পেপারকে ওয়েব পেইজে রূপান্তর করতে পারে।

গুগলের লোগো- জটিল ডিজাইন না জানার কারনে সহজ করেই তৈরী করা হয় এটি, যা পরে ব্রান্ডের সমান জনপ্রিয়তা পায়

আমেরিকার টাইম ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে গুগলের তিন নির্মাতা ল্যারী পেইজ, এরিক স্কিমিডিত ও সার্গেই ব্রিন।

সার্গেইর জীবনের একটি অন্যতম মুহূর্ত হলো যখন তিনি গুগলের সহ প্রতিষ্ঠাতা ল্যারি পেজের সান্নিধ্যে এলেন। তাঁদের ভাষ্য মতে, আমরা যে একে অপরের জন্য পাগল ছিলাম, তা নয়। কিন্তু আমাদের আগ্রহের মিল ছিল এবং তা হলো- বিপুল তথ্য ভান্ডার হতে একই ধরণের উপাত্তগুলো উদ্ধার করা। তাই তাঁরা খুব শীঘ্রই লিখে ফেলেন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পেপার যার নাম ছিল- ''দি এনাটমি অব এ লার্জ-স্কেল হাইপার টেক্সচুয়াল ওয়েব সার্চ ইঞ্জিন''। এই পেপারটি আজও স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জনপ্রিয়তম একটি প্রকাশনা।

সার্গেই প্রায়ই আমন্ত্রিত হন বিভিন্ন সম্মেলনে- তাঁর অভিজ্ঞতা বলার জন্য। এগুলো আয়োজন করে বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও তথ্য প্রযুক্তির প্রতিষ্ঠান। শুধু তাই নয়- টেলিভিশনের জনপ্রিয় শো- ''শার্লি রোগ শো'' সিএনবিসি, সিএনএন তাঁকে নিয়ে তৈরী করেছে একাধিক ডকুমেন্টরি ও প্রোগ্রাম। ২০০৫ সালের জানুয়ারীতে ওয়ার্ল্ড ইকোনোমি ফোরাম তাঁকে বিশ্বের একজন অন্যতম তরুণ বিশ্বনেতা বা ইয়ং গ্লোবাল লিডার উপাধিতে মনোয়ন দেয়।

গুগলের প্রথম সার্ভার (স্ট্যানফোর্ডেও ইনফোল্যাব হতে পাওয়া ছবি)

মাত্র ৩২ বছর বয়সে সম্পূর্ণ নিজ উদ্যোগে, নিজের প্রতিষ্ঠিত কোম্পানী (ল্যারিপেজের সাথে) গুগলে কাজ করে ১২.৯ বিলিয়ন ডলারের সমমূল্যের সম্পদের অধিকারী এখন এই সার্গেই ব্রিন। ১৯৯৪ সালে বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয় স্ট্যানফোর্ডের পড়াশুনা বাদ দিয়ে ল্যারি পেজের সাথে এক বন্ধুর গ্যারেজে গড়ে তোলেন গুগল কোম্পানীর সার্ভার। আর মাত্র এক দশকে গুগল হলো সার্চ ইঞ্জিনের প্রতিশব্দ। সময়ের সাথে নিত্যনতুন পণ্য ও সেবা যোগ করে গুগল প্রতিনিয়ত নিজেদের আকার ও উপযোগিতা বাড়িয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। একই সাথে নতুন কোম্পানি কিনে নিজেদের সাথে একীভূতকরণ, ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারিত্ব ও বিজ্ঞাপন জগতে নিজেদের অবস্থানকে সুদৃঢ়করণের মাধ্যমে নিজেদের বহুমুখিতাকে সমৃদ্ধ করেছে। ফলে তথ্য খোঁজার পাশাপাশি বর্তমানে ইমেইল, সামাজিক নেটওয়ার্কিং, ভিডিও শেয়ারিং, অফিস প্রোডাক্টিভিটি, প্রভৃতি বিষয়ে গুগলের সেবা রয়েছে।

আমেরিকার মাউন্টেন ভিউতে গুগলের বিশাল হেড কোয়ার্টার যা গুগল সিলিকন গ্রাফিক্স কোম্পানীর কাছ থেকে ৩১৯ মিলিয়ন ডলারে কিনে নেয়। সেরা মেধাবীরাই এখানে কাজের সুযোগ পেয়ে থাকে

এর প্রধান কার্যালয় ক্যালিফোর্নিয়ার মাউন্টেইন ভিউ শহরে অবস্থিত। গুগলের মূলমন্ত্র হল "তথ্য সন্নিবেশিত করে তাকে সবার জন্য সহজলভ্য করে দেয়া"। গুগলের নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক মূলমন্ত্র হলো- *Don't be evil*।

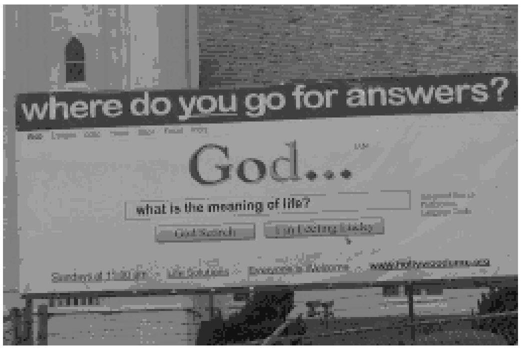

সব কিছুই জানা যায় গুগল করে- তাই হলিউডের এই বিলবোর্ডে গুগলকে ইশ্বরের সাথে তুলনা!

আজকাল ইন্টারনেট সার্চ করাকে অনেকে গুগল করাও বলে থাকেন। গুগলই কি ভবিষ্যতের ইশ্বর কিনা- বা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন অনেকেই! কারণ প্রতি-মূহুর্ত বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তের খবর আপনাকে এনে দেবে গুগলের শক্তিশালী সার্চ ইঞ্জিন।

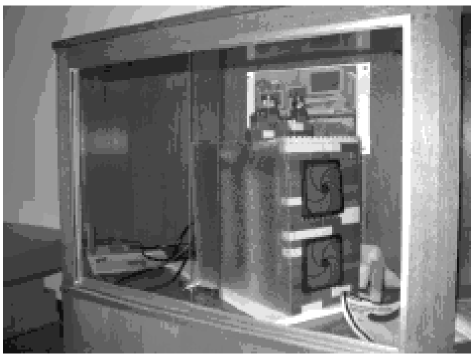

হাতে বানানো গুগলের প্রথম কম্পিউটার ডাটা ষ্টোরেজ। মোট ধারণ ক্ষমতা ছিল ৪০ গিগাবাইট মাত্র

Googol (10^{100})

10, 000, 000, 000, 000,
000, 000, 000, 000, 000,
000, 000, 000, 000, 000,
000, 000, 000, 000, 000,
000, 000, 000, 000, 000,
000, 000, 000, 000, 000,
000, 000, 000, 000

$১০^{১০০}$ সংখ্যাটাকেই বলে গুগোল- এখান থেকেই গুগল নামটি এলো!

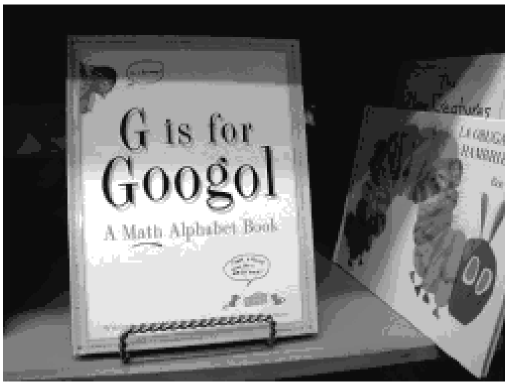

গুগল নামটি এখন বাচ্চাদের অক্ষর সেখাতেও ব্যবহৃত হয়!

মাইক্রোসফট সহ বিশ্বের অনেক বড় কোম্পানীই গুগলকে কিনে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু কারো চাপের মুখেই মাথা নত করেননি প্রতিভাবান সার্গেই ব্রিন এবং তার বন্ধু ও গুগলের সহ প্রতিষ্ঠাতা ল্যারি পেজ।

গণিতের সাথে রয়েছে গুগলের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। তাইতো বিশ্বের সেরা প্রোগ্রামারেরা গুগলে কাজ করাটাকে সম্মানের প্রতীক মনে বলে করেন। আর সব মিলিয়ে গুগলই অন্যতম একটি সেরা সার্চ ইঞ্জিন যার অন্যতম নির্মাতা হলেন এই সার্গেই ব্রিন।

ফ্রি সফটওয়্যার ফাউন্ডেশনের জনক-
রিচার্ড স্টলম্যান (Richard Stallman)

পুরো নাম তার রিচার্ড ম্যাথিউ স্টলম্যান। কাজ করেন বিনামূল্যের সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠান- ফ্রি সফটওয়্যার ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে। এমআইটির এআই ল্যাবের প্রাক্তন এই হ্যাকারই দুনিয়াখ্যাত গনুহ (GNU) প্রজেক্টের প্রধান চালক। GNU Emacs, GNU C compiler ও GNU Debugger প্রভৃতি সফটওয়্যার তৈরী ও বিতরণ সহ GNU Public License (GPL) এরও লেখক তিনি। কপিলেফট ধারণাটি তার কাছ থেকেই প্রথম আসে। ১৯৯০ সাল থেকে তিনি ফ্রি-সফটওয়্যার ক্যামপেইনের কাজ করেছেন।

স্টলম্যানের জন্ম নিউইয়র্কের ম্যানহাটন শহরে। বাবা ড্যানিস স্টলম্যান ও মা এলিস লিপম্যান। তিনি প্রথম কম্পিউটারে সান্নিধ্যে আসেন ১৯৬৯ সালে যখন ছিলেন হাইস্কুলের ছাত্র। আইবিএম কোম্পানীর নিউইয়র্ক গবেষণা কেন্দ্র তাকে হাইস্কুল পড়া শেষ হবার সাথে সাথেই নিয়োগ করে PL/1 প্রোগ্রামিং ভাষা ব্যবহার করে একটি প্রি-প্রসেসর তৈরীর কাজে। এর পাশাপাশি তিনি রকফেলার বিশ্ববিদ্যালয়ে বায়োলজি বিভাগের পরীক্ষাগারে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করতে শুরু করেন।

কিন্তু তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞানের প্রতি, তাই বায়োলজি ল্যাবের প্রধান যখন তাকে কম্পিউটারে কাজ করতে দেখেন তখন তিনি বেশ বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি চাইছিলেন যে, স্টলম্যান একজন বায়োলজিস্টই হোক।

হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ- এখানেই কম্পিউটারের প্রতি আগ্রহ তৈরী হয়েছিল স্টলম্যানের

যাই হোক, ১৯৭১ সালে কথা। স্টলম্যান তখন হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র। তখনই তিনি এমআইটির এআই (AI) ল্যাবের একজন প্রখ্যাত হ্যাকার। যার কাজ হলো সংরক্ষিত সফটওয়্যার প্রোগ্রামের তথ্য চুরি করা। স্টলম্যান তার স্নাতক পড়াশুনা শেষ করেন ১৯৭৪ সালে হার্ভাডের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ হতে ম্যাগনা কাম লাউড উপাধি নিয়ে। তারপর তিনি এমআইটিতে ভর্তি হন স্নাতকোত্তর পড়াশুনার জন্য কিন্তু তা আর কখনই শেষ করা হয়নি।

যাই হোক, তিনি এমআইটির ল্যাবে তার কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৯৭৭ সালে তিনি কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার একটি সফটওয়্যার সিস্টেম উদ্ভাবন করেন। তিনি এমআইটির ল্যাবে কাজ করার সময় থেকেই সংরক্ষিত বা পাসওয়ার্ড প্রটেক্টেড কম্পিউটার সিস্টেমের এক সমালোচক ছিলেন তিনি এবং একবার তিনি ল্যাবের পুরো পাসওয়ার্ড সিস্টেম ধ্বংস করে সবাইকে জানিয়ে দেন।

এমআইটির এআই (*AI*) ল্যাবের হ্যাকার হিসেবে নাম করেন স্টলম্যান। ব্যতিক্রমী আর্কিটেকচারের জন্য এই এআই ল্যাব বিল্ডিং এর সুনাম আছে।

আশির দশকের কথা। আস্তে আস্তে সফটওয়্যারের বাজার বড় হচ্ছে। এক মেশিনের সফটওয়্যার অন্য মেশিনে বা কম্পিউটারে চলতে পারছে। এমন সময় সবাই মিলে ঠিক করলো সফটওয়্যারের সোর্স কোড আর

উন্মুক্ত রাখা হবে না। অর্থাৎ সহজ কথায় সফটওয়্যার কিনেই ব্যবহার করতে হবে। একমাত্র স্টলম্যানই এই নীতির বিপক্ষে কথা বল্লেন, *"সফটওয়্যারের জন্য বিপুল টাকা চাওয়ার মানে হচ্ছে মানবতার বিরুদ্ধে একটি কাজ"।*

অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর এই প্রচার জনপ্রিয় হয়ে উঠিলো। তিনি ভাবতেন, সফটওয়্যারকে প্রতিবেশীদের সাথে মিলেমিশে উপভোগ করার কথা। কিছু টাকা দিয়ে বিনিময় করাটা সমর্থন করতে পারতেন না। অবশেষে তিনি অতি সম্ভাবনাময় মূল্যবান সফটওয়্যার তৈরীর কাজ ছেড়ে দিলেন এবং সেই সাথে ছাড়লেন এমআইটির মত বিশ্ববিখ্যাত ইন্সটিটিউটে পিএইচডির গবেষণা।

এন্টিলোপ প্রজাতির প্রানী গনুহ্ (*GNU*) এর ছবি হয়ে গেলো স্টলম্যানের কাজের লোগো

১৯৮৫ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন গনুহ (GNU) এবং ফ্রি সফটওয়্যার ফাউন্ডেশন, একই সাথে কপিলেফট (Copy left) ধারনাকে তিনি প্রচার করতে শুরু করলেন। স্টলম্যানের গনুহ (GNU) প্রজেক্টর মাধ্যমে ইউনিক্স ভিত্তিক একটি বিনামূল্যের অপারেটিং সিস্টেম তৈরীর কাজ এগিয়ে চল্ল। খুব শীঘ্রই তৈরী হল GNU/LINUX। যা ছিল মূলতঃ গনুহ সিষ্টেম এবং লিনাক্স কার্নেলের সম্মিলন। ১৯৯৯ সালে স্টলম্যান হাত দিলেন একটি উন্মুক্ত বিশ্বকোষ তৈরীর কাজে। ফলে তৈরী হলো GNUpedia নামের বিনামূল্যের এক বিশ্বকোষ যেখানে মানুষ সহজেই তথ্য সংরক্ষণ করতে এবং সংগ্রহ করতে পারবে।

কপি লেফট (*Copyleft*) কাজের লোগো- যা কপিরাইটের ঠিক আয়নাছবি।

মুক্ত সোর্স (*Copyleft*) কাজের লোগো

মুক্ত সফটওয়্যার লাইসেন্সের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত গনুহ জেনারেল পাবলিক লাইসেন্স বা জিপিএল (GPL)-এর মূল লেখক তিনি। বহুলভাবে ব্যবহৃত বেশ কয়েকটি সফটওয়্যারও তিনি লিখেছেন। মুক্ত সোর্স (Open Source) এর অর্থ হলো কম্পিউটার সফটওয়্যার এর সোর্স কোড বা মূল সাংকেতিক ভাষাকে মুক্ত ভাবে বিতরণ করা।

নববই দশকের শুরুতে যখন গনুহ অপারেটিং সিস্টেম উন্মুক্ত হবার অপেক্ষায়। তখন এর একটি বড় অংশ তখনও বাকী, আর সেই অংশটি হলো অপারেটিং সিস্টেম কার্নেল। সেই কাজটিকে সহজ করে দেন ফিনল্যান্ডের হেলসিংকি বিশববিদ্যালয়ের ছাত্র লিনাস টোরভাল্ডস ইউনিক্সভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম- মিনিক্স নিয়ে শখের বশে কাজ করতে করতে ১৯৯১ সালের মার্চ মাসে লিনুস তৈরি করে ফেলেন একটি অপারেটিং সিস্টেম কার্নেল। ফলে গনু অপারেটিং সিস্টেমের কার্নেল হিসেবে একেই বেছে নেয়া হয়, জন্ম নেয় মুক্ত সফটওয়্যার যুদ্ধের সবচেয়ে কার্যকরী - লিনাক্স। লিনাসের নামানুসারেই এর নামকরণ করা হয়। ফলে অনেকেই ধারণা করে বসেন লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমের পুরোটাই বোধহয় লিনাসের তৈরি করা। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে লিনাক্স হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেমের কার্নেল। লিনাক্স আসার পরপরই মুক্ত সফটওয়্যার আন্দোলন একটি নতুন মাত্রা পায়। উন্মুক্ত সোর্সকোড ভিত্তিক এই অপারেটিং সিস্টেম কম্পিউটার ব্যবহারকারী এবং প্রোগ্রামারদের সামনে নতুন দ্বার উন্মোচন করে।

তথ্যপ্রযুক্তির মতো বিশব রাজনীতিকেও বাণিজ্যের আওতামুক্ত করার পক্ষপাতী স্টলম্যান। তিনি মনে করেন, রাজনৈতিক ক্ষমতা সর্বাগ্রে লোভী ব্যবসায়ীদের হাতে চলে যাওয়াতেই গণতন্ত্রের মুক্তি সম্ভব হচ্ছে না। তাই ব্যবসায়ীদের হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব না হলে গণতন্ত্র তথা মানবতার মুক্তি সম্ভব নয়। এছাড়াও মুক্ত সফটওয়্যার আন্দোলনের অগ্রদূত স্টলম্যান মনে করেন সফটওয়্যারের বাণিজ্যিকরন পৃথিবীর প্রধান সমস্যা নয়। তাঁর মতে, বর্তমানে বিশেবর এক নম্বর সমস্যা হলো পরিবেশ দূষণ এবং গ্লোবাল ওয়ার্মিং । সাহিত্যেও তার অবদান কম নয়। মুক্ত সফটওয়্যার সম্পর্কে স্টলম্যান প্রচুর প্রবন্ধ লিখেছেন। তার সবেচেয়ে বিখ্যাত প্রবন্ধের নাম: *কেন সফটওয়্যারের মালিক থাকা উচিত নয়?* অনেকেই বলেন, মুক্ত সফটওয়্যার মানে হচ্ছে মেধার অপচয় বা মুক্ত সফটওয়্যার তৈরি করে কোন লাভ নেই । তাদের এসব প্রশ্নের সব জবাব আছে এই প্রবন্ধে। এ পর্যন্ত অনেক ভাষায় এই প্রবন্ধটি অনুবাদ করা হয়েছে। বিজ্ঞান কল্পকাহিনীর ভক্ত স্টলম্যান দুটি বিজ্ঞান কল্পকাহিনীও লিখেছেন। সফটওয়্যার কপিরাইট-এর প্যাটেন্টের বিরূদ্ধে মানুষকে সচেতন করতে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ২০০৬ সালে ভারতের কেরালায় রাজ্য সরকারের সাথে স্টলম্যানের এক বৈঠকের পর সরকার এই রাজ্যের প্রায় সাড়ে বারো হাজার উচ্চবিদ্যালয়ে কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে মাইক্রোসফট উইন্ডোজের বদলে উন্মুক্ত অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার সিদ্ধান্ত নেয়।

স্টলম্যানের তুলনা বিপ্লবী নেতা চেগুয়েভারার সাথে হতেই পারে

ব্যক্তি জীবনে স্টলম্যান একজন সাধারণ ছাত্রের মতো সস্তা জীবন-যাপনই বেশি পছন্দ করেন। মহাত্মা গান্ধী, মার্টিন লুথার কিং, নেলসন ম্যান্ডেলা, অং সান সু চি-র মতো মানুষেরাই তার জীবনে বেশি প্রভাব ফেলেছেন বলে মনে করেন তিনি। ব্যক্তিগত জীবনে নাস্তিক; জন্মসূত্রে খ্রিস্টান হলেও ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা কখনও পালন করা হয় না। কাজ শেষে অফিসেই ঘুমিয়ে পড়েন। মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন না তাঁর। ব্যাক্তিগত সম্পদ বলে তেমন কিছুই নেই এই মহান সফওয়্যার বিজ্ঞানীর। আসলে প্রায় গত তিন দশক ধরে তাঁর ধ্যান-জ্ঞান একটাই, আর তা হলো মুক্ত সফটওয়্যার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। স্টলম্যানের এই সব প্রতিভাবান এই কম্পিউটার বিজ্ঞানী কাজ করেন ফ্রি সফটওয়্যার ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে কিন্তু তাও আবার বিনা বেতনে। তিনি এত কম খরচ করেন যাতে তাকে কোন কিছুর উপর নির্ভর না করতে হয়। নিজের কোন বাড়ী নেই, গাড়ী নেই এবং বিভিন্ন শিক্ষালয়ে বক্তৃতা ও প্রাইজমানির অর্থ দিয়ে তাঁর দিন কাটে।

লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমের স্রষ্টা- লিনাস টোরভাল্ডস (Linus Torvalds)

লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম এখন বিশ্বজোড়া নামকরা একটি ফ্রি অপারেটিং সিস্টেম, যা কম্পিউটারকে অপারেট করতে সাহায্য করে। টানেনবামের তৈরী মিনিক্স অপারেটিং সিস্টেমটি দেখে লিনাস টোরভাল্ডস হাত দেন নতুন একটি অপারেটিং সিস্টেম তৈরীর কাজে। বর্তমানে যদিও তাঁর লেখা সংকেতের মাত্র ২% ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন লিনাক্স ডিস্ট্রিবিউশনে তারপরও বিশ্বের উন্মুক্ত অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে এর তুলনা নেই।

লিনাস টোরভাল্ডস এর জন্ম ফিনল্যান্ডে হেলসিনকি শহরে। বাবা ও মা দুজনেই সাংবাদিক। তার নামটি রাখা হয় আমেরিকান নোবেল প্রাইজ বিজয়ী লিনাস পাওলিং এর নামানুসারে। যদিও লিনাস টোরভাল্ডস তা স্বীকার করতে চান না কখনই। তাঁর মতে তান নাম হয়েছে পিনাট কমিকস এর নায়ক লিনাসের নাম অনুসারে।

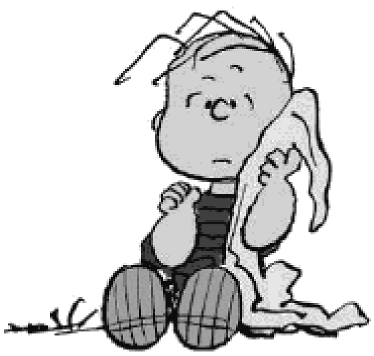

লিনাস ভ্যান পেলট- পিনাট কমিকের এই মজাদার চরিত্রের নামেই রাখা হয় লিনাস নামটি

লিনাস ফিনল্যান্ডের সুয়েডীয়ভাষী সংখ্যাসঘু জনগোষ্ঠীর একজন সদস্য; যারা ফিনল্যান্ডের জনসংখ্যার মাত্র ৫.৫%। তার বই: *Rebel Code: Linux and the Open Source Revolution*-এ, টোরভাল্ডস এভাবেই উদ্ধৃতি দেন যেমনটা তিনি বলেন, আমি মনে করি আমার নামকরণ করা হয়েছে কার্টুন ক্যারেক্টার লিনাস এর নামে, যা আমাকে একইসাথে নোবেল বিজয়ী রসায়নবিদ এবং কার্টুন চরিত্র বানিয়েছে।

কম্পিউটারের প্রতি লিনাসের আগ্রহ প্রকাশ পায় ছোট বেলায় কম্পিউটার কমোডোর VIC-20 নামের একটি কম্পিউটারের মাধ্যমে। প্রথম দিকে কম্পিউটারের ছোটখাট গেম তৈরীতেই তাঁর কাজ সীমাবদ্ধ ছিল। জনপ্রিয় কম্পিউটার গেম প্যাকমানের মত তিনি একটি গেম তৈরী করে ফেল্লেন এবং নাম দিলেন কুলম্যান। VIC-20 এর পর তিনি একটি Sinclair QL কেনেন যেটিতে তিনি ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেন- বিশেষত এর অপারেটিং সিস্টেমের। তিনি এই QL এর জন্য একটি অ্যাসেম্বলার এবং একটি টেক্সট এডিটর প্রোগ্রাম করেন ।

VIC-20 লিনাসের প্রথম কম্পিউটার

পরে তিনি ইন্টেল ৮০৩৮৬ প্রসেসর সম্বলিত আইবিএম পিসি কেনেন এবং তার মিনিক্স কপি পাওয়ার আগে কয়েক সপ্তাহ প্রিন্স অব পারসিয়া খেলে কাটান যেটি তাকে পরবর্তীতে লিনাক্স নিয়ে কাজ শুরু করতে সাহায্য করেছিল।

এটাই ফিনল্যান্ডের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় হেলসিনকি যেখানে পড়েছেন লিনাস

১৯৮৮ সালে লিনাস ভর্তি হলেন ফিনল্যান্ডের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় হেলসিনকিতে। ১৯৯৬ সালে তার স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর গবেষণা হিসেবে তিনি একটি পেপার লিখলেন যার নাম ছিল- ''লিনাক্স: এ পোর্টেবল অপারেটিং সিস্টেম। আর তারপরই শুরু হলো লিনাক্সের অগ্রযাত্রা।

লিনাস ইউনিভার্সিটি অফ হেলসিনকিতে পাঠরত অবস্থায় শখের বশে একটি কার্নেলের (কম্পিউটার বিজ্ঞানে, কার্নেল হল অপারেটিং সিস্টেমের কেন্দ্রীয় অংশ) ওপর কাজ শুরু করেন। এই কার্নেলটিই পরে লিনাক্স কার্নেলে রূপ নেয়। লিনাস প্রথমদিকে মিনিক্স নামের একটি সরলীকৃত ইউনিক্স-সদৃশ অপারেটিং সিস্টেম নিয়ে কাজ শুরু করেন। মিনিক্সের রচয়িতা ছিলেন এন্ড্রু টানেনবম, এক প্রখ্যাত অপারেটিং সিস্টেম ডিজাইন প্রশিক্ষক।

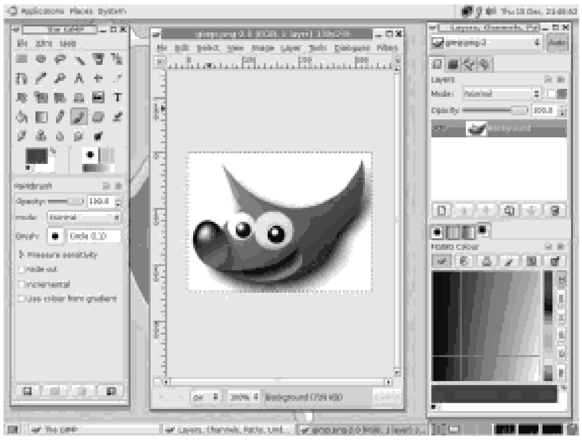

লিনাক্স: অপারেটিং সিস্টেম দেখতে যেমন

তবে টানেনবম তাঁর মিনিক্স সিস্টেমের ওপর সরাসরি কাজ করে উন্নতিসাধনের অনুমতি দিতেন না। ফলে লিনুসকে মিনিক্সের সমতুল্য একটি সিস্টেম বানাতে হয়। লিনাস টোরভাল্ডস প্রথমে আইএ-৩২ এসেম্বলার ও সি-এর সাহায্যে একটি টার্মিনাল এমুলেটর রচনা করেন ও এটিকে কম্পাইল করে বাইনারি আকারে রূপান্তরিত করেন, যাতে এটি যেকোনো অপারেটিং সিস্টেমের বাইরে ফ্লপি ডিস্ক থেকে বুট করে চালানো যায়। টার্মিনাল এমুলেটরটিতে একসাথে দুইটি থ্রেড চলত। একটি থ্রেড ছিল সিরিয়াল পোর্ট থেকে ক্যারেক্টার পড়ার জন্য, আর অন্যটি ছিল পোর্টে ক্যারেক্টার পাঠানোর জন্য। যখন লিনাসের ডিস্ক থেকে ফাইল পড়া ও লেখার প্রয়োজন পড়ল, তখন তিনি এই এমুলেটরটির সাথে একটি সম্পূর্ণ ফাইলসিস্টেম হ্যান্ডলার যোগ করেন।

এরপর ধীরে ধীরে তিনি এটিকে একটি সম্পূর্ণ অপারেটিং সিস্টেম কার্নেলে রূপ দেন, যাতে এটিকে পজিক্স-অনুগামী সিস্টেমসমূহের ভিত্তিরূপে ব্যবহার করা যায়।

লিনাক্স কার্নেলের প্রথম সংস্করণ (০.০.১) ইন্টারনেটে প্রকাশ পায় ১৯৯১ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর। কিছুদিন পরেই ১৯৯১-এর অক্টোবরে এর দ্বিতীয় সংস্করণটি বের হয়। তখন থেকে সারা বিশব থেকে হাজার হাজার ডেভেলপার লিনাক্সের এই প্রজেক্টে অংশ নিয়েছেন।

বর্তমানে লিনাক্স কার্নেলের উন্নয়নে দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন লিনাস টোরভাল্ডস নিজে, তবে কার্নেলের সহযোগী অন্যান্য ব্যবস্থাগুলো, যেমন গনুহ উপাদানগুলো, আলাদাভাবে তৈরী করা হচ্ছে। আর লিনাক্স বিতরণকারী বিক্রেতা বা প্রতিষ্ঠানগুলোর বর্তমান কাজ হচ্ছে এই সবগুলো উপাদান একত্র করে এবং এর সাথে গ্রাফিকাল ইন্টারফেস (যেমন এক্স-উইন্ডো সিস্টেম-ভিত্তিক গনোম বা কেডিই) ও এপ্লিকেশন সফটওয়্যার যোগ করে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচালক ব্যবস্থা তৈরী করা।

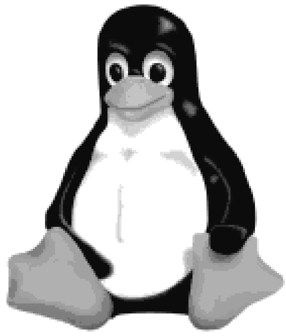

এই টাক্স (TUX) নামের পেঙ্গুইনটিই হলো লিনাসের মাসকট যেটি এখন পুরো লিনাক্স কমিউনিটি গ্রহণ করেছে।

টাক্স হচ্ছে লিনাক্স কার্নেলের অফিসিয়াল মাসকট। ১৯৯৬ সালে ল্যারি ইউয়িং তৈরী করেছিলেন এই টাক্স লোগো, দেখতে স্থুলাকার এক পেঙ্গুইন, যে বসে আছে খুব শান্তি ও সন্তুষ্টি নিয়ে। লিনাক্সের মাসকট হবে পেঙ্গুইন এটি ভেবেছিলেন লিনাক্স কার্নেলের ডেভেলপার নিজেই। টাক্স ডিজাইন করা হয়েছিল লিনাক্সের এক লোগো প্রতিযোগিতায়, এবং এটি ডিজাইন করা হয়েছিল গিম্প (গিম্প একটি মুক্ত সোর্স গ্রাফিক্স প্যাকেজ। ইংরেজি GIMP নামটি হচ্ছে GNU Image Manipulation Program এর সংক্ষিপ্ত রূপ। বলা হয়ে থাকে যে গিম্প হচ্ছে এডোবি ফটোশপের বিকল্প) ব্যবহার করে। লিনাস কেনো পেঙ্গুইন বেছে নিয়েছিলেন, সেই বিষয়ে প্রচলিত কাহিনী হলো যে, লিনাস যখন অস্ট্রেলিয়ায় বেড়াতে গিয়েছিলেন, তখন একটি পেঙ্গুইনকে আদর করার সময় সেটি তাঁর হাতে কামড় দিয়েছিল। লিনাস সেই অভিজ্ঞতার জন্যই পেঙ্গুইনকে লিনাক্সের মাসকট হিসাবে বেছে নেন।

''লিনাক্স'' কেই উইন্ডোজের প্রধান শত্রু ভাবা হয়ে থাকে

''লিনাক্স'' নামটি কিন্তু যদি লিনাস টোরভাল্ডস এর দেওয়া নয়। লিনাক্সের নামকরণের কৃতিত্ব আরি লেমকের। লেমকে হেলসিংকি ইনটিটিউট অফ টেকনলজিতে ftp.funet.fi নামক একটি এফটিপি সার্ভারের প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করছিলেন। সার্ভারটি ছিল ফিনীয় বিশববিদ্যালয় ও গবেষণা নেটওয়ার্ক-এর একটি অংশ, আর এই নেটওয়ার্ক-এর সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটি ছিল যদি লিনাস টোরভাল্ডস এর ইউনিভার্সিটি অফ হেলসিংকি। লিনাস যখন তার অপারেটিং সিস্টেম প্রকলটি এই সার্ভারটিতে রক্ষা করার জন্য লেমকে-কে দেন, লেমকে তখন তা একটি ডিরেক্টরিতে রাখেন ও ডিরেক্টরিটির নাম দেন ''লিনাক্স'', যার

মানে হলো ''লিনাস এর মিনিক্স''। লিনাস অবশ্য নিজে প্রকল্পটির নাম ''ফ্রিক্স'' (freeX) রাখতে চাচ্ছিলেন, যা ছিল ''ফ্রি'' (বিনামূল্য) ও ইউনিক্সের শেষ অক্ষর ''এক্স''-এর সম্মিলিত রূপ। শেষ পর্যন্ত লেমকের দেয়া লিনাক্স নামটিই টিকে যায়।

তাদের এখন তিন কন্যা- মিরান্দা, ইরোলান্দা এবং আমান্দা। আরও আছে একটি পোষা বেড়াল নাম তার রান্দি!

লিনাসের জীবনের মজার এক ঘটনা হলো এরকম তিনি একবার তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি কম্পিউটার ক্লাশ নিচ্ছিলেন। ক্লাশ শেষে তিনি তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের বলেন, তোমাদের যা শেখালাম তার পরীক্ষা হিসেবে আমাকে সবাই একটি ইমেল করবে। যারা তাঁকে ইমেল করেছিল তাদের মধ্যে একটি ছাত্রীর নাম ছিল টোভ। সে তার ইমেইলে লিখেছিল, আমি আপনার সাথে দেখা করতে চাই। অচিরেই লিনাসের সাথে টোভের পরিচয় হলো এবং বিয়েও হয়ে গেল। আরও একটি মজার ব্যাপার হলো টোভ কিন্তু ফিনল্যান্ডের জাতীয় পর্যায়ের ছয়বার কারাটে চ্যাম্পিয়ন।

কাজের সুবিধার্থে লিনাস টোরভাল্ডস চলে এলেন আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া সানিজোসে শহরে। কাজ করতে শুরু করলেন ট্রান্সমেটা নামের একটি সংস্থায়। যারা ছিলো ব্যতিক্রমী পণ্য উৎপাদনে পথিকৃত। তিনি উন্মুক্ত সোর্স উন্নয়ন প্রকল্পে যোগদান করেন, যেটি লিনাক্স ফাউন্ডেশন এ পরিনত হয়েছিল ফ্রি স্ট্যান্ডার্ড গ্রুপের সাথে একীভূত হওয়ার মাধ্যমে, পরবর্তীতে যার আনুকূল্যে তিনি কাজ চালিয়ে যান। পরে Red Hat এবং VA লিনাক্স, দুই লিনাক্স নির্ভর সফটওয়্যারের নেতৃত্বদানকারী ডেভেলপার তাঁর সৃষ্টির জন্য কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ষ্টক অপশনে টোরভাল্ডসকে উপস্থাপন করে। ১৯৯৯ এ উভয় কোম্পানি ষ্টক নিয়ে জনগনের কাছে যায় এবং এর ফলে টোরভাল্ডস এর মূল্যমান খুব দ্রুত ২০ মিলিয়ন ডলারে এর উপরে পৌছে যায়।

কিন্তু অন্য সব ওপেন সোর্স ডেভেলপারদের মত তিনি চমকপ্রদ প্রচার-প্রচারণা চালান না কখনই। বরং নিজেকে আড়ালে রাখতেই ভালবাসেন। কখনও প্রতিদ্বন্দী কোম্পানীগুলোর প্রতি বিরূপ মন্তব্য ছুড়ে বিতর্কের সৃষ্টি করেন না। যদিও তারপরও তাঁকে সমালোচনার মধ্যে আসতে হয়েছে ট্রান্সমেটা কোম্পানীতে কাজ করার জন্য, যারা অর্থের বিনিময়ে সফটওয়্যার বিক্রয় করে। শুধু তাই নয় বিটকিপার নামের একটি সফটওয়্যার দিয়ে লিনাক্স কার্নেলের ভার্সন রক্ষার কাজ করেও তিনি সমালোচিত হন। কারণ এটি বিনামূল্যের সফটওয়্যার পণ্য ছিল না। পরবর্তীতে অবশ্য এর পরিবর্তে ওপেন সোর্স সফটওয়্যার গিট (Git) ব্যবহার করেন এই কাজে। টোরভাল্ডস সাধারণত non-kernel-related বিতর্কের বাইরে থাকেন। যদিও টোরভাল্ডস বিশবাস করেন যে *সফটওয়্যার তৈরীর সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে মুক্ত সফটওয়্যার পদ্ধতি*, তারপরও মালিকানাভিত্তিক সফটওয়্যার হলেও তিনি কাজের জন্য সবথেকে ভাল টুলস ব্যবহার করেন।

লিনাসের বিনামূল্যের সফটওয়্যার ব্যবহার না করাটা অনেকে দ্বিমুখী ভাবেন

যাই হোক, লিনাস টোরভাল্ডস নিজেকে মধ্যপন্থী কম্পিউটার প্রযুক্তিবিদ বলতে চান। যার একটি হাত কাজ করে ওপেন সোর্স পণ্য উৎপাদনে এবং অপর হাত বিভিন্ন প্রোপাইটারী সফটওয়্যার ব্যবহার করে। লিনাস টোরভাল্ডস এর রয়েছে অসংখ্য নামী প্রকাশনা। এর মধ্যে-*"জ্যাস্ট ফর ফান- দি স্টোরী অব অ্যান অ্যাক্সিডেন্টালি রেভোলেশনারী"* একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। যেখানে তিনি নিছক আনন্দের জন্য তৈরী লিনাক্সে বিশ্বজয়ের গল্প লিখেছেন।

২০০১ সালে তিনি জনকল্যাণের জন্য পেয়েছেন তাকেদা অ্যাওয়ার্ড রিচার্ড স্টলম্যানের সাথে। শুধু তাই নয় একটি মহাকাশ তারকার নামও রাখা হয়েছে তাঁর নামানুসারে। স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে দিয়েছে সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধি।

টাইম ম্যাগাজিন তাকে বিশ্বের সবচেয়ে উৎসাহব্যঞ্জক ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছে। লিনাসের উপর নির্মিত হয়েছে ডকুমেন্টরি চিত্র- *দি কোড*। সিএনএন সহ অসংখ্য চ্যানেল ও পত্রিকা তার সাক্ষাৎকার প্রচার করেছে। মাত্র ৩৮ বছরের এই কম্পিউটার বিজ্ঞানী মাইক্রোসফট সহ অসংখ্য বড় সফটওয়্যার কোম্পানীর জন্য চিন্তার ব্যপার। কারণ প্রতিভাবান লিনাস কখনও তাঁর মেধা দিয়ে ব্যবসা করেন না!

অ্যাপল কম্পিউটারের স্বপ্নদ্রষ্টা- স্টিভ জবস (Steve Jobs)

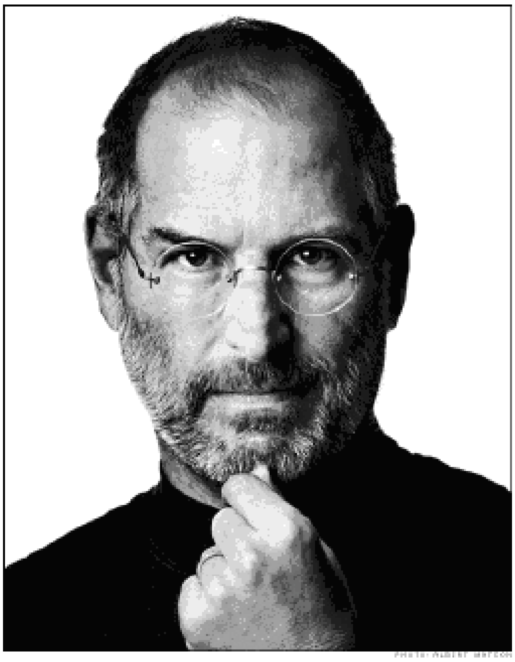

কম্পিউটার প্রযুক্তি ও এনিমেশন বিনোদন জগতের একটি অনস্বীকার্য নাম হলো- স্টিভ জবস। অ্যাপল কম্পিউটারের সহ-প্রতিষ্ঠাতা (স্টিভ ওজনিয়্যাকের সাথে) ও পিক্সার অ্যানিমেশন স্টুডিওর সিইও হিসেবে তার নাম বিশ্বজোড়া। সিলিকন ভ্যালির উদ্যোক্তাদের মাঝে তাঁকে অন্যতম একজন বলে ধরা হয়ে থাকে। তার কাজ এবং উৎপন্ন পণ্যকে একদিকে যেমন কার্যকর অপরদিকে অভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে মনে করা হয়।

অ্যাপেলই প্রথম কম্পিউটারে নিয়ে আসে ডিজাইন ও রং এর বাজার। যা খুবই মনোমুগ্ধকর এবং হৃদয়গ্রাহী। শুধু তাই নয় ১৯৮৫ সালে তিনি যখন অ্যাপল হতে চলে যান এবং তারপর থেকে অ্যাপেলের অবস্থাও বেশ খারাপ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে আবার অ্যাপলের হাল ধরেন তিনি এবং যথারীতি সেটিকে একাধারে লাভজনক ও অভিজাত এক কম্পিউটার সামগ্রী নির্মানের প্রতিধ্বনি হিসেবে স্বীকৃত করে তোলেন।

স্টিভ জবস এর জন্ম যুক্তরাজ্যের ক্যালিফোর্নিয়ার সান ফ্রান্সিসকো শহরে। তাঁর বাবা মিশরীয় ও মা আমেরিকান। বাবার নাম আবদুল ফাত্তাহ জান্দালী ও মায়ের নাম জোয়ানো ক্যারল। কিন্তু জবস এর জন্ম হয় তাঁর বাবা মায়ের বিয়ের আগেই। তাই তাকে দত্তক দিয়ে দেন তার মা মাউন্টেন ভিউ এর এক পরিবারের কাছে। ফলে স্টিভ জবস পেলেন নতুন বাবা-মা পল ও ক্লারা জবস। তারাই তাঁর নাম রাখেন স্টিভ জ্যবস। যদিও তাঁর আসল বাবা-মা পরবর্তীতে বিয়ে করে এবং জন্ম দেয় স্বনামখ্যাত উপন্যাসিকা মোনা সিম্পসনের। কিন্তু সেই বিয়েও শেষ পযন্ত থাকেনি। স্টিভ জবস সবসময়ই তার দত্তক মা-বাবাকেই নিজের বলে দাবি করেন। এমনকি তাঁর পারিবারিক উপাধিটিও তাদের কাছ হতে পাওয়া।

ক্যালিফর্নিয়ার এই নামকরা হোমস্টিড হাই স্কুলের ছাত্র ছিলেন জবস। এখান থেকেই যা পড়শুনা তার! এর পর আর পড়া হয়নি

যাই হোক, স্টিভ জবস যখন ক্যালিফর্নিয়ার হোমস্টিড হাই স্কুলের ছাত্র তখনই তিনি হিউলেট-প্যাকার্ড কোম্পানীর পার্ট টাইম কাজ পেয়ে যান পাউলো-আলটোতে। ১৯৭২ সালে স্নাতক পড়াশুনা শেষ করে ভর্তি হন পোর্টল্যান্ডের রীড কলেজে। কিন্তু মাত্র এক সেমেস্টার পড়াশুনা করেই ছেড়ে দিলেন সেখানে যাওয়া। যদিও ক্যালিগ্র্যাফীর একটি কোর্সে পড়াশুনাটা তিনি ঠিকই চালিয়ে গেছেন। পরবর্তী সময়ে স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন ছাত্রদের সামনে লেকচার দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, *''আমি যদি ঐ একটি কোর্সে পড়া ছেড়ে না দিতাম হয়তো ম্যাক কম্পিউটারে চমৎকার সব শৈল্পিক ফন্ট কখনই তৈরী হতো না।''*

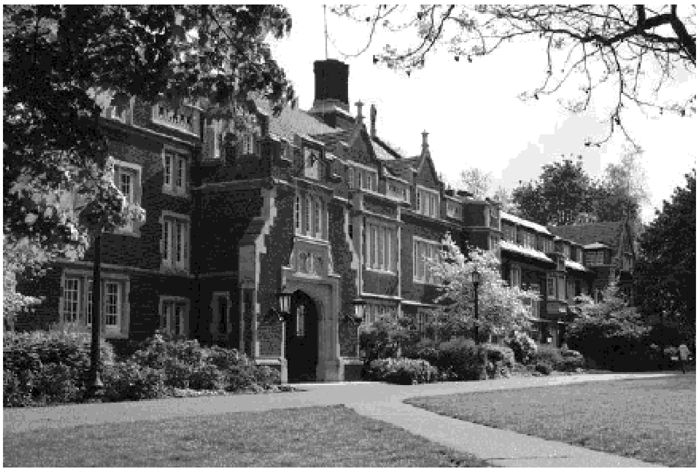

পোর্টল্যান্ডের রীড কলেজে এক বছর পড়েই বাদ দিলেন জবস। সফল কলেজ ড্রপ-আউট ছাত্রদের আরও একজন হতে তখনও অনেক বাকী

১৯৭৪ সালে শরৎকালে জবস তার স্টিভ ওজনিয়্যাকের সাথে হোমব্রিউ কম্পিউটার ক্লাবের মিটিংগুলোয় যোগ দিতে লাগলেন। সেই সাথে জনপ্রিয় ভিডিও গেম নির্মাতা আটারী কোম্পানীতে টেকনিশিয়ান হিসেবে যোগ দিলেন। যদিও মূল উদ্দেশ্য ছিল টাকা জমিয়ে ভারত মহাদেশে আধ্যাত্মিক শক্তির সন্ধানে বেড়িয়ে আসা। যেমন ভাবা তেমন কাজ, কিছু দিনের মাঝেই তার কলেজ বন্ধু ড্যানিয়েল কোট্টাকের সাথে চলে এলেন ভারতে।

জবস যখন আবার আমেরিকায় ফিরে গেলেন তখন তিনি পুরোদস্তর ভারতীয়। মাথার চুল কামানো এবং পরনে ভারতীয় পোষাক। তবে তিনি আবার সেই আটারী কোম্পানীতেই যোগ দিলেন। এবার আটারী

তাঁকে কাজ দিল ভিডিও গেমের সার্কিট বোর্ডে চিপের সংখ্যা কমিয়ে আনার। কিন্তু জবস এই কাজ করতে তেমন উৎসাহ হলেন না। তাই তাঁর বন্ধু ওজনিয়্যাককে অনুরোধ করলেন তাঁর হয়ে কাজটি করে দেওয়ার। আসলে জবসের সার্কিট সম্পর্কে তেমন ভালো ধারণা ছিল না। যাইহোক, স্টিভ ওজনিয়্যাক কাজটি করে দিলেন। ফলে জবস তার প্রাপ্য অর্থের অর্ধেক ভাগ করে নিলেন ওজনিয়্যাকের সাথে। কিন্তু এখানেও একটি খারাপ ব্যাপার ঘটালেন তিনি। আটারি যেখানে জবসকে ৫০০০ ডলার দিচ্ছিল সেখানে তিনি তাঁর বন্ধুকে বলেন মাত্র ৭০০ ডলারের কথা। ফলে বন্ধু ওজনিয়্যাকের ভাগে পড়লো মাত্র ৩৫০ ডলার।

অবিশ্বাস্য লাগলেও সত্য এটিই প্রথম অ্যাপল কম্পিউটার! হাতে তৈরী এই কম্পিউটারটিতে শুধু কিছু সার্কিট ছিল যা হোমব্রিউ কম্পিউটার ক্লাবে দেখানোর জন্য বানানো হয়েছিল

২১ বছর বয়সে জবস লক্ষ্য করলেন তাঁর বন্ধু ওজনিয়্যাক নিজের ব্যবহারের জন্য একটি কম্পিউটার ডিজাইন করে ফেলেছে। তখন তিনি ওজনিয়্যাককে অনুরোধ করলেন একটি কম্পিউটার কোম্পানী তৈরীতে তাঁকে সহায়তা করার জন্য।

১৯৭৬ সালের এপ্রিল জন্ম নিল অ্যাপল কম্পিউটার কোম্পানী। স্যার আইজ্যাক নিউটনের মধ্যাকর্ষণ সূত্র আবিষ্কারের সেই আপেলকে প্রতীক হিসেবে নিয়ে যাত্রা শুরু হলো। যদিও প্রথম দিকে তাঁদের ইচ্ছে ছিল শুধুমাত্র সার্কিট বোর্ড বিক্রয় করা কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা পুরোপুরি কম্পিউটারই তৈরী করে ফেলতে সক্ষম হলেন। সেই কম্পিউটারের নাম ছিল অ্যাপল-১ এবং বিক্রি হতো ৬৬৬.৬৬ ডলারে। এই অদ্ভুত দামের পেছনেও ছোট একটি ব্যাপার রয়েছে। সেই সময়ে বিশেষ নম্বরে ফোন করে রগরগে কৌতুক শোনার ব্যবস্থা ছিল এবং এই কাজটি ওজনিয়্যাকের ছিল খুব প্রিয়। তাই তার প্রিয় ফোন নম্বর 'ডায়াল-এ-হর্নি-জোক' কে ব্যবহার করা হলো অ্যাপল-১ এর বাজারদর হিসেবে।

অ্যাপল কম্পিউটার ম্যাকিন্টস- হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার সবই নিজেদের তৈরী। এই নীতি অ্যাপল কোম্পানী আজও বজায় রেখেছে।

অ্যাপল-২ যখন বাজারে এলো চারিদিকে হইচই পড়ে গেল। তৎকালীন সময়ে কম্পিউটার জগতে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলো। অবশেষে ১৯৮০ সালের মে মাসে বাজারে এলো অ্যাপল-৩ যা আরও বেশি সফলতার মুখ দেখলো এবং জবস এর ভবিষ্যৎও নিশ্চিত হয়ে গেল।

এভাবে অ্যাপল কম্পিউটার কোম্পানীর পরিধি বাড়তেই লাগালো। ১৯৮৩ সালে জবস পেপসি-কোলা কোম্পানীর জন স্কাউলিকে অ্যাপলের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসেবে আমন্ত্রন জানালেন। তাকে বল্লেন, *"বন্ধু, তুমি কি বাকী জীবন চিনির পানি বিক্রি করেই কাটাবে নাকি দুনিয়াটা বদলে দেওয়ার একটা চেষ্টা নেবে।"* বলাই বাহুল্য এই কথার পর জন স্কাউলি অ্যাপলের দ্বায়িত্বভার নিয়ে এর প্রচুর উন্নতি করেন। একই বছর অ্যাপল লিসা নামের এক অভিনব প্রযুক্তির উদ্ভাবন করে কিন্তু তা বাণিজ্যিকভাবে দারুন ক্ষতিগ্রস্থ করে অ্যাপলকে।

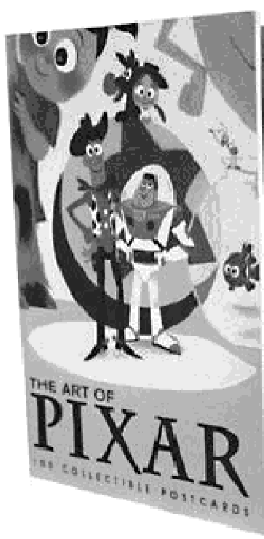

অ্যাপল কম্পিউটার ছেড়ে দিয়ে জবস পিক্সার কোম্পানীর মধ্যমে এনিমেশন তৈরীতে বিপুল সাফল্য দেখালেন

যে সময়ে স্টিভ জবস তাঁর ক্যারিশমাটিক উপস্থিতির মাধ্যমে অ্যাপেল কম্পিউটারকে দারুন জনপ্রিয় করে তুলছিলেন ঠিক তখনই অ্যাপলের বেশ করেকজন চাকুরে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে লাগালো রূঢ়

আচরণের। ফলশ্রুতিতের ১৯৮৫ সালে, বেশ কিছু অন্তঃকলহের পর অ্যাপলের বোর্ড অব ডিরেক্টরস তাঁর অনেক দায়-দায়িত্ব কমিয়ে আনতে চাইলো। প্রতিবাদ হিসেবে স্টিভ জবস পুরো অ্যাপল থেকেই সরে এলেন। এরপর কিছুদিন মন খারাপ করে নিজের প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীর একটি বাদে সব শেয়ারই বিক্রি করে দিলেন। ১৯৮৬ সালে লুকাস ফিল্ম কোম্পানীর কাজ থেকে ৫ মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে কিনে নিলেন একটি কম্পিউটার এনিমেশন সংস্থা যার নাম দিলেন পিক্সার। এটিই পরবর্তীতে টয় স্টোরী, মনস্টার ইংক, ফাইন্ডিং নিমোর মতো অসাধারণ সব এনিমেশন মুভি তৈরী করে এবং অ্যাকাডেমী অ্যাওয়ার্ড জিতে নেয়।

যাই হোক, পিক্সার কোম্পানীর পাশাপাশি স্টিভ জবস কাজ শুরু করলেন নতুন ধরনের এক কম্পিউটার উদ্ভাবনের কাজ, যার নাম দিলেন নেক্সট (NEXT)। এটি ছিল ওয়ার্ক স্টেশন প্রযুক্তির কম্পিউটার যা শক্তিশালী কিন্তু বাণিজ্যিকভাবে এটি তেমন লাভবান হতে পারলো না। কারণ নেক্সট কম্পিউটারের দাম ছিল অত্যাধিক। নেক্সটকে বলা হতো ''ইন্টারপারসোনাল কম্পিউটার''। এটি মূলতঃ গবেষক ও বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হলো। বিভিন্ন প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনে এটি যথেষ্ট অবদান রাখলো। বিশেষ করে অবজেক্টে ওরিন্টেড সফটওয়ার ডেভেলপমেন্ট, সিগন্যাল প্রসেসিং চীপ ও ইন্টানেট পোর্ট উদ্ভাবনে এটি কাজে লাগানো। শুধু তাই নয়, নেক্সট কম্পিউটারেই প্রথম এমন ইমেইল ব্যবস্থা প্রদর্শন করা হলো যাতে ছবি, শব্দ এবং মাউস-ক্লিকের দ্বারা ইমেল করা যায়।

এটি অ্যাপল কম্পিউটার ছেড়ে দিয়ে জবস বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হলেন নেক্সট কম্পিউটারের মাধ্যমে। কিন্তু বাণিজ্যিক ভাবে এটি ছিল ব্যর্থ

১৯৯৩ সালে নেক্সাট কোম্পানীর কার্যক্রম পুরোপুরি সফটওয়্যার ভিত্তি হয়ে গেল এবং মাত্র ৫০,০০০ কম্পিউটার বিক্রয়ের পর তারা কম্পিউটার তৈরীর কাজ পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়ে নেক্সটস্টেপ, ইন্টেল ও সান মাইক্রো সিস্টেমের সাথে ওপেনস্টেপ নামে প্লাটফর্ম তৈরীর কাজে নামলো। এরপরও নেক্সট কম্পিউটারের অবদান অনস্বীকার্য। কারণ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের প্রধান উদ্যোক্তা ও উদ্ভাবক টিম বার্নাস লী কিন্তু তাঁর গবেষণা কর্মটি চালিয়েছিলেন এই কম্পিউটারেই।

ক্যালিফোর্নিয়ায় তৈরী হলো অ্যাপলের বিশাল হেড অফিস যার

নাম ইনফিটি লুপ

১৯৯৬ সালে অ্যাপল কোম্পানী নেক্সটকে কিনে নেয় ৪০২ মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে এবং স্টিভ জবসকেও ফিরিয়ে আনে তাঁর আপন প্রতিষ্ঠানে। আসলে এছাড়া কোন উপায়ও ছিল না। কারণ, ৯০ দশকের শুরু থেকেই অ্যাপলের অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছিল এবং বলা চলে দেউলিয়াই হয়ে পড়ছিল তারা। তাই তারা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল জবসকে ফিরিয়ে আনতে হবে এবং তাঁর অনন্য সাধারণ লীডারশীপই এই অবস্থার পরিবর্তন আনতে পারে।

১৯৯৭ তে স্টিভ জবস আবার অ্যাপল কোম্পানীর ভারপ্রাপ্ত চিফ অপারেটিং অফিসার হিসেবে যোগদান করলেন এবং জবস তখনই অ্যাপলের কিছু অলাভজনক প্রকল্প বন্ধ করে দিলেন এর মধ্যে ছিল নিউটন, সাইবারডগ ও ওপেনডর্ক প্রকল্প। ফলে অনেক কর্মকতাই চাকুরী হারাবার ভয়ে তাঁর মুখোমুখি হতে চাইতো না। কিন্তু তাঁর এই দৃঢ় সিদ্ধান্তের দরুন ১৯৯৮ সালের মার্চে আবার অ্যাপল লাভের মুখ দেখলো। জবস তার নেক্সটস্টেপ ব্যবহার করে তৈরী করলেন ম্যাকওসএক্স (MacOS X)।

জবস অ্যাপলে ফিরে এলে আইম্যাক কম্পিউটার বাজারে এলো এবং এর শৈল্পিক সৌন্দর্য সবাইকে মুগ্ধ করে দিল

এভাবে জবস এর পরিকল্পনা মাফিক কাজই করে অ্যাপলের নতুন কম্পিউটার আইম্যাক (iMac) বাজারে এলো এবং এর শৈল্পিক সৌন্দর্য সবাইকে মুগ্ধ করে দিল। সুপার কম্পিউটারের প্রযুক্তি আর রং এর ব্যবহারই এর মূল চালিকা শক্তি। জবস এর বুদ্ধিতে অ্যাপল বিনোদন জগতেও পা রাখলো এবং সকলের মন জয় করে নিল আইপড (ipod) দিয়ে। সেই সাথে মিউজিক সফটওয়্যার আইটিউনস্ (iTunes) তৈরী করা হলো ভোক্তাদের সুবিধার্থে।

এতো সাফল্যের পরও স্টিভ জবসের বেতন মাত্র ১ ডলার। তাঁকে বলা হয় দুনিয়ার সবচেয়ে কম বেতনের চিফ অপারেটিং অফিসার। ২০০০ সালের ম্যাক এক্সপোতে অ্যাপল কোম্পানী জবসের সিইও পদটি ভারপ্রাপ্ত হতে স্থায়ী করে দিল। কিন্তু তাঁর বেতন এক ডলারই রয়ে গেল। অবশ্য কোম্পানী তাঁকে অন্যভাবে সুবিধা দিতে লাগলো। যেমন- ৯০ মিলিয়ন ডলারের বিশাল জোট বিমান, ৩০ মিলিয়ন শেয়ার ইত্যাদি। তাঁর এই কম বেতন অবশ্য তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চমানের ট্যাক্স রেট (যা মূল আয়ের ৩৫%) হতে দারুন রেহাই দেয়।

স্টিভ জবস এর লীডারশীপ একদিকে যেমন অ্যাপলের জন্য দারুন লাভজনক অপরদিকে তার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত (যেগুলোকে বলা হয় স্টিভনোট) সমালোচিতও হয়। বিশেষ করে, পাওয়ার ম্যাক জি-৪ কিউব কম্পিউটারের উচ্চমূল্য ও ম্যাকের সমস্ত ক্লোনের অপসারন ইত্যাদি বেশ সমালোচিত হয়। আরও একটি ব্যাপার স্টিভকে নিয়ন্ত্রন করতে হয়েছিল এবং তা হলো যেসব ম্যাক যা অ্যাপল কম্পিউটার বাতিল হয়ে যাচ্ছে তা দিয়ে কি করা হবে?

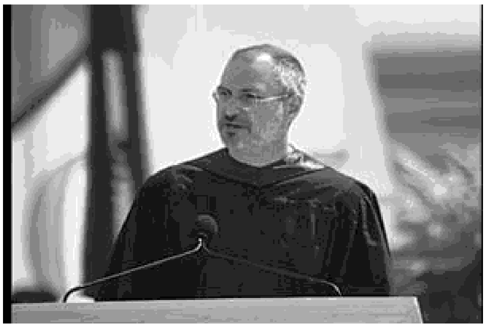

স্টিভ জবস যখন স্ট্যানফোর্ডে স্নাতক অনুষ্ঠানে এলেন। আন্দোলনকারীরা প্লেনে করে একটি ব্যানার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগলো

সামাজিকভাবে এটির বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দ্বায়ভারও অ্যাপলকেই নিতে হবে। শেষ পর্যন্ত অ্যাপল কোম্পানী সিদ্ধান্ত নিল তারা নষ্ট হয়ে যাওয়া বা বাতিল হওয়া সব আইপড বা গান শোনার যন্ত্র বিনে পয়সায় বিভিন্ন স্থান হতে সংগ্রহ করে নিবে। কিন্তু এতেও ''কম্পিউটার টেকব্যাক'' সামাজিক আন্দোলনকারীরা তেমন খুশি হতে পারলো না। এমনকি স্টিভ যখন স্ট্যানফোর্ডে স্নাতক অনুষ্ঠানে এলেন। আন্দোলনকারীরা প্লেনে করে একটি ব্যানার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যেত লাগলো, যাতে লেখা ছিল ''স্টিভ এটা ভেবো যে একটি মিনি প্লেয়ারের রিসাইকেল তাবৎ ই-বর্জ্যকে সরিয়ে ফেলবে।''

অবশেষে ২০০৬ সাল থেকে অ্যাপল নতুন পলিসি নির্ধারন করে নিল, যেখানে বলা হলো, নতুন কোন অ্যাপল কম্পিউটার কিনলে অ্যাপল কোম্পানী নিজ দায়িত্ব পুরোনোটাকে ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অধীনে নিয়ে নিবে।

এদিকে সেই ১৯৮৬ সালে স্টিভ জবস লুকাস ফিল্মের কাছ থেকে যে অ্যানিমেশন স্টুডিওটি কিনেছিলেন এবং যা পরবর্তীতে পিক্সার নামে পরিচিত হয়েছিল, সেটির চুক্তি হলো ডিজনী কোম্পানীর সাথে। তৈরী হতে লাগলো অসাধারণ সব অ্যানিমেশন চিত্র। ১৯৯৫ এ তৈরী হল বিখ্যাত কার্টুন চিত্র ''টয়স্টোরী''। খেলনার মানুষ ও যন্ত্রপাতিদের নিয়ে জীবন্ত এই ত্রিমাত্রিক অ্যানিমেশনটি ছোট বড় সকলের মন জয় করে নিল। এরপর একে একে তৈরী হলো এ বাগস্ লাইফ (১৯৯৮), টয় স্টোরী-২ (১৯৯৯), মন্সটার ইনক্ (২০০১), ফাইন্ডিং নিমো (২০০৩) এবং ইনক্রেডিবলস্ (২০০৪)। এদের মধ্যে ইনক্রেডিবকলস্ বেস্ট অ্যানিমেটেড ফিচার হিসেবে অ্যাকাডেমী অ্যাওয়ার্ড লাভ করলো।

স্টিভ জবস এর অ্যানিমেশন প্রতিষ্ঠান পিক্সার ডিজনীর সাথে যুক্ত হয়ে তৈরী করতে লাগলো চমৎকার যত কার্টুন চিত্র

কিন্তু খুব শীঘ্রই আবার নতুন সমস্যা দেখা দিল। ডিজনী কোম্পানীর সাথে পিক্সারের চুক্তি শেষ হয়েছিল ২০০৪ সালে। কিন্তু নবায়ন করতে গেলে সমস্যা দেখা দিল। ডিজনী কোম্পানীর চিফ এক্সিকিউটিভ মাইকেল ইসনার এবং স্টিভ জবসের মাঝে কিছুতেই মতের মিল হলো না। তাদের মধ্যকার ব্যক্তিগত ঝামেলা দুই কোম্পানীকেই বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিল। ফলে বন্ধ হয়ে গেল নতুন অ্যানিমেশন মুভি তৈরীর কাজ। শেষ পর্যন্ত ২০০৫ সালে ইসনারকে ডিজনী হতে সরিয়ে ফেলা হলো এবং ৭.৪ বিলিয়ন ডলার মূল্যে স্টিভ জবস তাঁর সাধের অ্যানিমেশন সংস্থা পিক্সারকে ডিজনীর কাছে বিক্রি করে দিলেন এবং নিজেকে ডিজনীর বোর্ড অব ডিরেক্টদের মধ্যে যুক্ত করলেন। জবসকে ডিজনীর ৭% শেয়ার দেওয়া হলো যেখানে ডিজনীর এমরিটাস পরিচালক রয় ই. ডিজনীর শেয়ার মাত্র ১% । ২০০৬ সালের ৯ই জুন জবস এবং ডিজনীর অন্যান্য পরিচালকদের দক্ষ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে রিলিজ হলো নতুন ত্রিমাত্রিক চিত্রকলা "কারস"(Cars) এবং আবার তাঁর দারুন পেশাদারী মনোভাবকে সমর্থন দিল এটি।

ব্যক্তিগত জীবনে ১৯৯১ সালের ১৮ই মার্চ জবস বিয়ে করেন তাঁর নয় বছরের ছোট লরেন পাউয়েলকে। তাঁর পরিবারে তিনটি সমন্তান জন্ম নেয়। কিন্তু অ্যান নামের আরও একটি মেয়ের সাথে জবস এর সম্পর্ক হয় এবং জন্ম নেয় জবসের আরও এক কন্যা লিসা। সম্ভবতঃ তাঁর নামেই অ্যাপলের তৎকালীন লিসা প্রজেক্টের নাম রাখা হয়েছিল।

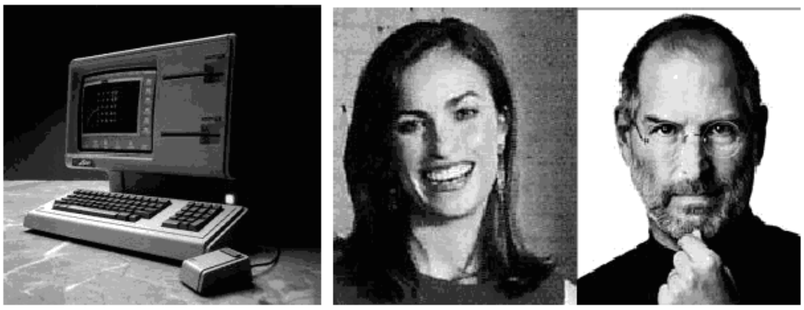

লিসা প্রজেক্টের জন্ম হয় তার পিতৃহীন কন্যা লিসার নামে, যার মা অ্যানকে তিনি কখনও বিয়ে করেননি

জবসের বেশ কিছু বায়োগ্রাফী বের হয়েছিল বিভিন্ন সময়ে এবং যেগুলোকে তিনি নিজেই অবৈধ ঘোষণা করেন। এমনই একটি হলো *"সেকেন্ড কামিং অব স্টিভ জবস"*। যেখানে বলা হয় রীড কলেজে পড়ার সময় জবসের জোয়ান বাইজ নামের এক মেয়ের সাথেও সম্পর্ক তৈরী হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁকেও তিনি বিয়ে করেননি। মজার ব্যাপার হলো এই জোয়ানা আবার প্রখ্যাত গায়ক বব ডিলানেরও প্রেমিক ছিল।

জবস নিজেকে নিরামিষভোজী বলে দাবী করলেও কার্যত তিনি মোটেই তা নন। ১৯৮২ তে তিনি সান রেমোতে একটি অ্যাপার্টমেন্ট কিনেন যেখানে রাজকন্যা ইয়াসমীন আগা খান থাকতো। পরবর্তীতে এটি তিনি ইউ-২ (U2) ব্যান্ডের নামকরা গায়ক বোনোর কাছে বিক্রি করে দেন।

বিখ্যাত সান রেমোতে একটি অ্যাপার্টমেন্ট কিনেন জবস যা পরে ব্যান্ডের নামকরা গায়ক বোনোর কাছে বিক্রি করে দেন

আবার ১৯৮৪ তে সতের হাজার বর্গফুটের বিশাল এক স্পেনীয় রাজপ্রাসাদ কিনেন ক্যালিফোর্নিয়া উডসাইডে। এটি জ্যাকলিং হাউজ নামে পরিচিত ছিল যার স্থপতি ওয়াশিংটন স্মিথ। প্রায় দশ বছর জবস এখানেই থাকলেন এবং পরবর্তীতে ১৯৯৮ সালে বিল ক্লিনটনও এটিকে ব্যবহার করেন তাঁর কন্যাকে স্টানফোর্ডে পড়ানোর সময়। কিন্তু ক্রমেই প্রাসাদের অবস্থার অবনতি ঘটতে লাগলো এবং এমন অবস্থার দাঁড়ালো যে, এটিকে আর ঠিকই করা যাবে না। তাই শেষ পর্যন্ত জবস ঠিক করলেন এটি ভেঙ্গে তিনি ছোট একটি আধুনিক বাড়ি বানাবেন। কিন্তু স্থানীয়রা তাদের এত দিনের ঐতিহ্যবাহী প্রাসাদটি ভাঙ্গাতে দিতে চাইলো না। ফলে জবস পড়লেন মহা ঝামেলায়। সবশেষে, ২০০৪ সালে সরকারের কাছ থেকে অনুমতি পাওয়া গেল প্রাসাদটি ভাঙ্গার কিন্তু একটি শর্তের বিনিময়ে। শর্তটি হলো কেউ যদি প্রাসাদটি না ভেঙে এর উন্নয়ন করতে চায় তবে তাকেই এটি দিয়ে দিতে হবে। অনেকেই আগ্রহ দেখাল এর প্রতি কিন্তু কাউকেই দেওয়া হলো না। আবার এটি ভাঙ্গাতেও দিচ্ছে না স্থানীয় আন্দোলনকারীরা। ফলে আজ পর্যন্ত স্টিভের রাজকীয় প্রাসাদ ঐ অবস্থাতেই আছে।

বিশাল এক স্পেনীয় রাজপ্রাসাদ কিনেন ক্যালিফোর্নিয়া উডসাইডে কিমন্তু বিপদে আছেন স্থানীয়রা তাদের এত দিনের ঐতিহ্যবাহী প্রাসাদটি ভাঙ্গাতে দিতে চায়না

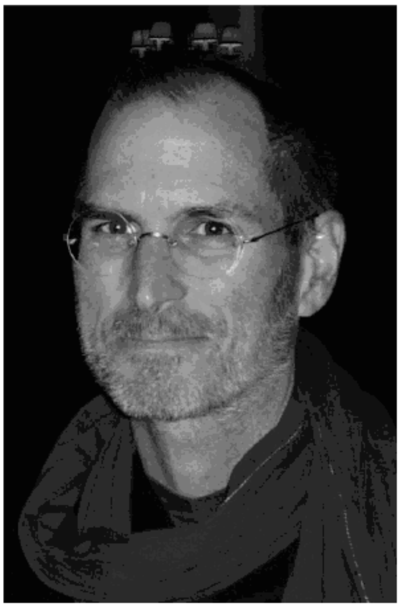

অসুস্থতার কারনে এখন অ্যাপল থেকে ছুটিতে আছেন জবস

২০০৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে জবস এর পেটে একটি টিউমার ধরা পড়ে। যদি সেটি খুব ভয়াবহ ছিল না কিন্তু জবস বলেন, টিউমারটি খুবই জটিল এবং সারানো খুবই কঠিন হবে। অথচ স্বল্প সময়েই ডাক্তারেরা এটি সারিয়ে দিল কোন রকম কেমোথেরাপি বা রেডিয়েশনের ব্যবহার না করেই। তাঁর অবর্তমানে অ্যাপলের দায়িত্ব নিয়েছিলেন টিমসি কুক এবং ভালই চালিয়ে ছিলেন। ২০০৬ সালে এসে স্টিভ জবস প্রমান করলেন তিনিই তথ্য প্রযুক্তির দুনিয়ার অন্যতম এক সফল ব্যক্তি। একাধারে অ্যাপল কোম্পানী সিইও এবং ডিজনীর বোর্ড অব ডিরেক্টরদের একজন হয়ে নিজেকে তথ্য ও বিনোদন জগতের শৈল্পিক এক কারিগর হিসেবে প্রকাশ করতে সক্ষম হলেন। তাঁর কাজকর্ম এবং উৎপাদিত পণ্যের কার্যক্ষমতা ও আভিজাত্য সকলকে এখনও মুগ্ধ করে রেখেছে। স্টিভ জবসকে নিয়ে নির্মিত হয়েছে একাধিক ডকুমেন্টারী ও চিত্রকলা। এদের মধ্যে ‘‘পাইরেটস অব সিলিকন ভ্যালী’’, ‘‘ট্রিয়মম্ফ অব নেরডস’’, ‘‘নেরডস ২.০.১’’ এবং অ্যানিমেশন ‘‘ইউরেকা-৭’’ উল্লেখ্য।

অ্যাপলের আরেক কারিগর - স্টিভ ওজনিয়্যাক (Stephen Gary "Woz" Wozniak)

অসাধারণ প্রতিভাধর কম্পিউটার বৈজ্ঞানিক স্টিভ ওজনিয়্যাকের জন্ম ক্যালিফোর্নিয়ার সানজোসে শহরে। তার উদ্ভাবিত কম্পিউটার ''অ্যাপল-১'' সত্তর দশকে চরম জনপ্রিয় হয়ে উঠে। ১৯৭৬ সালে স্টিভ জবস এই ওজনিয়্যাকের সাথেই জন্ম দেন অ্যাপল কম্পিউটার কোম্পানি। তাঁদের উদ্ভাবিত ''অ্যাপল-২'' ও সত্তর-আশির দশকে কম্পিউটারপ্রেমীদের মাতিয়ে রেখেছিল। ১৯৮৫ সালে ওজনিয়্যাক অ্যাপল ছেড়ে চলে যান এবং আর কখনও ফিরে আসেননি।

স্টিভ ওজনিয়্যাকের ডাকনাম ''ওজ''। ওজের জাদুকর গল্পে অনুকরণেই তার এই নামকরণ। তিনি আমেরিকার বিখ্যাত ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়াতে (বার্কলে) পড়তে গেলেন ১৯৭৫ সালে। কিন্তু অল্প কিছু পড়েই আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন এবং ছোটখাট ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি বানাতে শুরু করেন। অবশ্য তার অধিকাংশ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যই ছিল সেই সময়ের পাউলো-আলতোর হোম-ব্রিউ কম্পিউটার ক্লাবের সদস্যদের একটুখানি মুগ্ধ করা। এই সব প্রজেক্টের তেমন কোন ভবিষ্যৎও ছিল না বলা চলে।

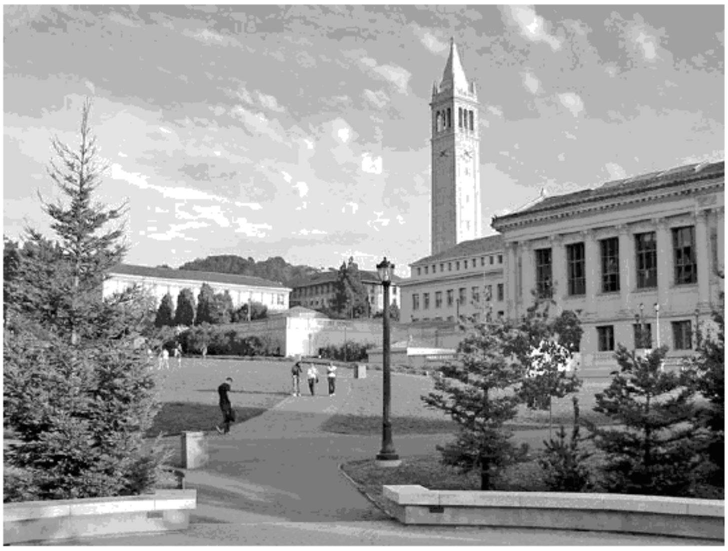

আমেরিকার বিখ্যাত ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়াতে পড়তে গেলেন ১৯৭৫ সালে কিন্তু অল্প কিছু পড়েই আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। পরে অবশ্য ১৯৮৬ সালে আবার এখানে ফিরে এসে ব্যাচেলর ডিগ্রী নেন। কিন্তু তাও নিজের নামে নয়- রকি ক্লার্ক ছদ্মনামে

বন্ধু জবসের সাথে মিলে ওজ ঠিক করলেন তারা একটি কম্পিউটার তৈরী করবেন এবং বাজারে বিক্রিও করবেন। ব্যস যেমন ভাবা তেমনই কাজ। নিজের এইচপি সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর ও স্টিভ জবসের ভক্সওয়াগনটি বিক্রি করে ১৩০০ ডলার পাওয়া গেল এবং সেই টাকায় তাঁরা দুজন রাত-দিন খাটাখাটি করে তৈরী করলেন কাঙ্খিত সেই কম্পিউটারের প্রটোটাইপ বা নমুনা। এটি তৈরী হলো জবসের বাসার গ্যারেজে। তাদের প্রথম এই কম্পিউটারটি ছিল সেই সময়ের হিসেবে অসাধারণ একটি যন্ত্র।

তখন বাজারে সাধারণতঃ যে কম্পিউটার পাওয়া যেত তার নাম ছিল আল্টিয়ার-৮৮০০। কিন্তু এর ছিল না কোন ডিসপ্লে কিংবা সত্যিকারের স্টোরেজ ব্যবস্থা। এমনকি আউটপুটও আসতো লাইট ফ্লাশিং এর মাধ্যমে। এই ধরনের কম্পিউটার শখের ইলেকট্রনিক কাজের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে কিন্তু সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য অবশ্যই নয়।

অন্যদিকে ওজের কম্পিউটার ''অ্যাপল-১'' ছিল সবদিক থেকেই দারুন স্বয়ং সম্পূর্ণ। এতেছিল ২৫ ডলারের একটি মাইক্রোপ্রসেসর যার নাম মস ৬৫০২ এবং স্থায়ী মেমরী বা রম (ROM)।

স্টিভ ওজনিয়্যাকের (বামে) সাথে কাজে ব্যসত্ম স্টিভ জবস

১৯৭৬ সালের পহেলা এপ্রিলে ওজ তার বন্ধু জবসের সাথে গঠন করলেন অ্যাপল কম্পিউটার কোম্পানী। এর জন্য তিনি তার হিউলেট-প্যাকার্ডের চাকুরীও ছেড়ে দিলেন এবং অ্যাপলে যুক্ত হলেন গবেষণা ও উন্নয়ন শাখার সহকারী প্রেসিডেন্ট হিসেবে।

স্টিভ ওজনিয়্যাকের ''অ্যাপল-২'' কম্পিউটার। তৎকালীন সময়ে চরম জনপ্রিয়তা পায় এই কম্পিউটারটি

এবার তিনি তার পুরো সময় এবং মেধা ব্যয় করলেন ''অ্যাপল-১'' এর উন্নয়নে। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি উদ্ভাবন করলেন ''অ্যাপল-২'' যাতে ছিল উন্নত রেজুলেশনের ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা যেখানে অন্যান্য কম্পিউটার শুধুমাত্র লেখা প্রদর্শন করেই ক্ষান্ত ছিল। তিনি এতে একটি ফ্লপি ডিস্ক কন্ট্রোলার যুক্ত করলেন এবং সেই সাথে রান্ডি উইগিংটনকে (ম্যাকরাইট সফটওয়্যারের জনক, অ্যাপল কোম্পানীর প্রথম কর্মী) নিয়ে লিখে ফেলেন একটি আদর্শ ডিস্ক অপারেটিং সিস্টেম। এভাবে হার্ডওয়্যার যন্ত্রাংশ ডিজাইনের পাশাপাশি ওজ নিজেই অ্যাপলেন বেশির ভাগ সফটওয়্যারও লিখে ফেলতে লাগলেন। তৈরী করলেন ক্যালভিন নামের একটি উন্নত প্রোগ্রামিং ভাষার ইন্টাপ্রেটর, সুইট-১৬ নামের ১৬-বিট প্রসেসরের ইন্সট্রাকসন সেট, ব্রেকআইট নামের একটি কম্পিউটার গেম ইত্যাদি। এই গেমটি তৈরী করতে গিয়েই তিনি বুঝতে পারলেন এখন সময় এসেছে কম্পিউটারের সাথে স্পিকার যুক্ত করার, যাতে এটি শব্দও করতে পারে।

১৯৮০ সালে ওজ মিলিয়নিয়ার বনে গেলেন। তাঁকেই অ্যাপল কম্পিউটারের গডফাদার বলা হতো। কিন্তু এর পরই ঘটলো অঘটন। ''অ্যাপল-২'' এর পর ''অ্যাপল-৩'' তেমন বাজার ধরতে পারলো না এবং পাশাপাশি আরেক লিসা প্রকল্পেরও ধস নামালো। ১৯৮১ তে ওজ সামত্মাক্রুজ স্কাই পার্কে একটি বিমান দুর্ঘটনায় কিছুদিনের জন্য তাঁর স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। কিভাবে এই দুর্ঘটনাটি ঘটলো এবং কোথায় এইসব কোন তথ্যই তাঁর মনে রইলো না। তাঁর বান্ধবী সিন্ডি ক্লার্কের কাছে পর্যন্ত জানতে চাইলেন কি ঘটেছিল সেইদিন। যখন সিন্ডি আস্তে আস্তে সব খুলে বলল ওজের স্মৃতিশক্তি ফিরে আসতে লাগলো। যদিও ওজের কম্পিউটার গেমের আসক্তিও স্মৃতিশক্তি ফেরাতে সহায়তা করে অনেকটাই।

স্টিভ ওজনিয়্যাক স্কাই পার্কে একটি বিমান দুর্ঘটনায় কিছুদিনের জন্য তাঁর স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। ছবিটি সেই স্কাই পার্কেরই

সেই প্লেন দুর্ঘটনায় ওজের এই দুরবস্থা হয়েছিল তার নাম ছিল ''বীচ বোনানজা''। সান্তাক্রুজের স্কাইপার্ক থেকে উড়তে গিয়ে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। কিন্তু সুস্থ্য হওয়ার পর ওজনিয়্যাক আর অ্যাপলে ফিরে গেলেন না। বরং তিনি তাঁর বান্ধবী ক্লার্ককে বিয়ে করলেন। যাকে তিনি মজা করে ''সুপার ওম্যান'' বলে ডাকতেন। কারণ, সুপারওম্যানের হারানো স্মৃতিশক্তি (ক্রিপনোইটের আঘাতে) ফেরাতে সুপার ওম্যানের ভূমিকাই বেশি। যাইহোক, অ্যাপলে না গিয়ে তিনি বরং তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি বার্কলেতে ফিরে এলেন এবং ১৯৮৭ সালে তার স্নাতক পড়াশুনা শেষ করলেন। কিন্তু তাও নিজের নামে নয় রকি ক্লার্ক ছদ্মনামে। রকি ছিল তাঁর কুকুরের নাম আর ক্লার্ক হলো বউ এর শেষ নাম। এর মধ্যে যদিও তিনি একবার অ্যাপলে ফিরে এসেছিলেন কিন্তু সামান্য এক ইঞ্জিনিয়ারের চেয়ে বেশি বড় কোন পদ নিতে চাইলেন না। বরং সহকর্মীদের উৎসাহ দিতেই তার বেশি ভাল লাগতো।

স্টিভ ওজনিয়্যাক আমেরিকার বিখ্যাত ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া বার্কলে থেকে অবশেষে ডিগ্রী নিলেন তাঁর প্রিয় কুকুর রকির ছদ্মনামে

এবার তিনি আরেক নতুন কোম্পানী তৈরী করেন যার নাম ''ক্লাউড-৯'' এর কাজ ছিল ইউনিভার্সাল রিমোট কন্ট্রোল তৈরী করা। যা দিয়ে নানা রকম যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। ১৯৮৭ তে এটি তৈরী হলো।

এরপর তিনি প্রকৌশলী কাজকর্মও ছেড়ে দিলেন। সব বাদ দিয়ে তিনি স্কুলের ক্লাশ ফাইভের বাচ্চাদের পড়াতে শুরু করলেন। শুধু তাই নয়, নিজের সমস্ত অর্থই তিনি দান করে দিলেন স্থানীয় একটি স্কুলে (যেখানে তিনি ছোটবেলায় পড়েছিলেন) যার নাম ছিল বাটস গ্যাটোস ডিস্ট্রিক্ট স্কুল। এর পাশাপাশি তৈরী করলেন ইউনুসন (Unuson-Unite us In Song) নামের একটি দাতব্য সংস্থা যার মাধ্যমে আমেরিকার বড় বড় দুটি উৎসব আয়োজন করলেন।

সানজোসের বাচ্চাদের একটি জাদুঘরের সামনের রাস্তাটির নামকরণ করা হলো তারই নামানুসারে ওজ ওয়ে (*Woz Way*)

সানজোসের বাচ্চাদের একটি জাদুঘরেও তিনি বহু অর্থ দান করলেন এবং এর উন্নয়নে কাজ করে সকলের মন জয় করে নিলেন, বিশেষ করে বাচ্চাদের। সেই জাদুঘরের সামনের রাস্তাটির নামকরণ করা হলো তাঁরই নামানুসারে ওজ ওয়ে (Woz Way), আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগান তাকে প্রযুক্তিতে অবদান রাখার জন্য ন্যাশনাল মেডল অব টেকনোলজি প্রদান করলেন। ১৯৯৭ তে কম্পিউটার ইতিহাসের জাদুঘর তাঁকে ফেলো হিসেবে অন্তর্ভূক্ত নিল। ২০০০ সালে আমেরিকার জাতীয় উদ্ভাবকদের লিস্টিতে যুক্ত করা হলো।

২০০২ সালে তিনি আবার তথৎ প্রযুক্তির মাঝে ফিরে এলে এবং হুইলস অব জিউস বা সংক্ষেপে ওজ (Woz) প্রকল্পের শুরু করলেন তারবিহীন গ্লোবাল পজিসনিং সিস্টেমের উদ্ভাবন করা। একই বছর তিনি ডেনগার ইনকোর্পোরেটের বোর্ড অব ডিরেক্টরদের একজন হিসেবে যোগ দিলেন এবং টি-মোবাইলেন জন্য হিপটপ নামের একটি প্রযুক্তি তৈরী করতে লাগলেন।

টি-মোবাইলেন জন্য হিপটপ নামের একটি প্রযুক্তি ওজ নতুন আবিষ্কার

২০০৪ সালে ড. টম মিলারের উদ্যোগে ওজকে নর্থ ক্যারোলিনা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করলো কম্পিউটার জগতে বিশেষ অবদান রাখার জন্য। ২০০৫ সালে ওজ আরো দুটি ডক্টরেট ডিগ্রি পেলেন মিশিগান ও ফ্লোরিডার দুটি নামী বিশ্ববিদ্যালয় হতে। পাশাপাশি বাচ্চাদের স্কুলের জন্য ছোটখাট কাজে ব্যসস্ত রইলেন।

বাচ্চাদের স্কুলে ওজ

একই বছর তার হুইলস অব জিউস প্রকল্প বন্ধ করে দিয়ে নতুন এক প্রকল্পের শুরু করলেন যার নাম অ্যাকুইয়ার টেকনোলজি। এর কাজ ছিল বিভিন্ন প্রযুক্তির কোম্পানী হতে টেকনোলজি অধিগ্রহণ এবং সেই টেকনালজির উন্নয়ন সাধন করা।

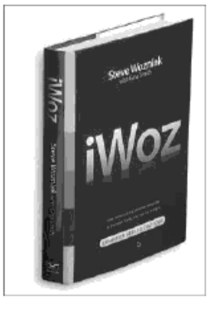

স্টিভ ওজনিয়্যাকের বিখ্যাত বই *iWoz*

ওজের আত্মজীবনী প্রকাশ করা হলো ২০০৬ সালে যার নাম ছিল *"আইওজ: ফ্রম কম্পিউটার গিক টু কাল্ট আইকন-হাউ সাই ইনভেন্টেড পার্সনাল কম্পিউটার, কো-ফাউন্ডেড অ্যাপল এন্ড হ্যাড ফান ডুইং ইট (iWoz: From Computer Geek to Cult Icon: How I Invented the Personal Computer, Co-Founded Apple, and Had Fun Doing It.)"*

স্টিভ ওজনিয়্যাক ব্যস্ত আছেন পোলো খেলা নিয়ে

এখন ওজ ব্যস্ত আছেন পোলো খেলা নিয়ে। তিনি ক্যালিফোর্নিয়া সমুদ্রতটের স্যাগওয়ে পোলো টীমের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। তার দলে আছেন সিলিকন ভ্যালীর কম্পিউটার জগতের আরও অনেক ভগ্নহৃদয় প্রযুক্তিবিদ।

ব্যক্তিজীবনে ওজ একজন মজার মানুষ। সেই সময় তিনি তাঁর বাসা হতে ডায়াল-এ-জোক নামের মজার এক ফোন সার্ভিস চালু করেন। এই কাজ করতে গিয়েই তাঁর পরিচয় হয় একটি মেয়ের সাথে এবং পরবর্তীতে তাকেই তিনি বিয়ে করেন।

স্টিভ ওজনিয়্যাক খেলছেন ভিডিও গেইমস

দুষ্ট কাজেও তিনি ছিলেন ওস্তাদ ব্যক্তি। ক্যাসিনোর ছেড়া স্লিপ সংগ্রহ করে সেগুলো দিয়ে বই বানিয়ে আবার বই স্লিপ কেটে দর্শনার্থীর কাছে বিক্রি করা ছিল তাঁর প্রিয় কাজের মধ্যে একটি। এরকম করতে গিয়ে লাস ভেগাসের এক ক্যাসিনোতে একবার ধরাও পড়তে হয় তাঁকে। তিনি খুব ভাল গিটারও বাজাতে পারেন। তার প্রিয় একটি উক্তি হলো *''এমন কম্পিউটারকে কখনও বিশ্বাস করো না, যা তুমি জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলতে পারো না।''* তার এই বিখ্যাত উক্তি পরবর্তীতে ব্যবহৃত হয় সিভিলাইজেশন-৪ নামের একটি কম্পিউটার গেমে।

ওজকে নিয়েও বিভিন্ন সময়ে নির্মিত হয়েছে ডকুড্রামা ও কার্টুন চিত্র। এদের মধ্যে ''ক্যাম্প নাওহয়্যার'' চরিত্রে দেখা যায় ওজের নাম নিয়ে এক ব্যক্তি বাচ্চাদের ক্যাম্পে নিয়ে পালায়। ''ইউরেকা-৭'' কার্টুন চিত্রে দেখা যায় এক হ্যাকারের নাম ওজ। এমনকি লার্স নামের জনপ্রিয় সংগীত শিল্পীর গান ''আহাব'' এ ওজের কথা শুনতে পাওয়া যায়। এছাড়া ''পাইরেটস অব সিলিকন ভ্যালী'' ও ''ট্রিয়াম্পফ অব নেরডস'' ডকুড্রামাতেও ওজের ছদ্ম উপস্থিতি দেখা যায়।

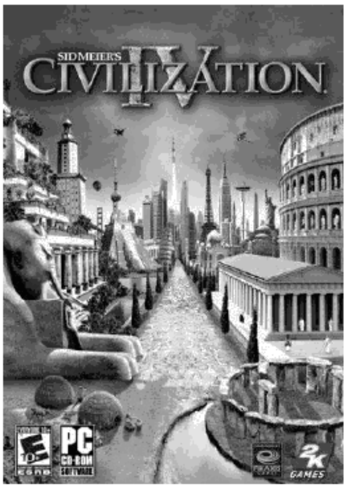

''এমন কম্পিউটারকে কখনও বিশ্বাস করো না, যা তুমি জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলতে পারো না।'' তাঁর এই বিখ্যাত উক্তি পরবর্তীতে ব্যবহৃত হয় সিভিলাইজেশন-৪ নামের একটি কম্পিউটার গেমে

স্টিভ ওজনিয়্যাক এখন কম্পিউটারের চেয়ে ছোটখাট স্কুলের কাজ করতেই বেশি ভালবাসেন

প্রতিভাবান এই কম্পিউটার বৈজ্ঞানিক ওজ তাঁর প্রথম জীবনে পারসনাল কম্পিউটারের উন্নয়নের জন্য অবদান রাখেন কিন্তু পরবর্তীতে কম্পিউটারে কাছ থেকে সরে এসে নিয়েজিত হন সমাজ কল্যাণে এবং নিলোর্ভ এই ব্যক্তি এখন ছোট ছোট কাজের মাঝেই আনন্দ খুঁজে পান।

ওরাকল ডাটাবেইজের জনক-
ল্যারি অ্যালিসন (Lawrence Joseph "Larry" Ellison)

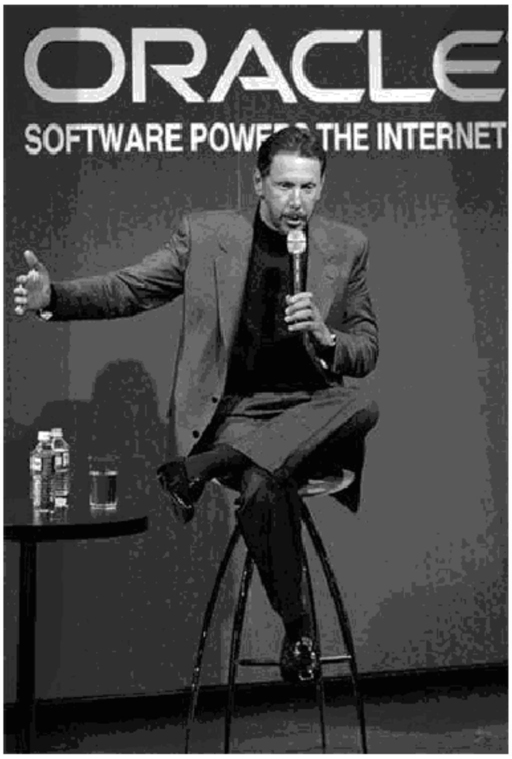

ল্যারি অ্যালিসনের পুরো নাম লরেন্স জোসেফ অ্যালিসন। তিনি বিশ্ববিখ্যাত ওরাকল ডাটাবেইজ প্রতিষ্ঠানের সহপ্রতিষ্ঠাতা এবং চিফ অফিসার হিসেবে এখন কর্মরত। ১৯.৬ বিলিয়ন ডলারের মালিক ল্যারি বিশ্বের ৯ম ধনী ব্যক্তি। এমনকি ২০০০ সালে তিনি কিছু সময়ের জন্য ১ম স্থানটিও দখল করে নিয়েছিলেন কিছু সময়ের জন্য বিল গেইটসকে হারিয়ে।

অ্যালিসনের জন্ম নিউইর্য়ক শহরের ম্যানহাটন দ্বীপে। তাঁর মায়ের নাম ফ্লোরেন্স স্পেলম্যান কিন্তু বাবার পরিচয় নেই। ১৯ বছর বয়সে অবিবাহিত অবস্থায় তাঁর মা তাকে জন্ম দেন এবং লালন পালনের দায়িত্ব নেন না। বরং নয় মাস বয়সে তাঁকে অ্যালিসন পরিবারের কাছে দত্তক দিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর পালক বাবার নাম লুইস অ্যালিসন ও মায়ের নাম ছিল লিলিয়ান। তারা দুজন মিলে তাঁকে নিয়ে দক্ষিণ শিকাগোর এক দুই রুমের অ্যাপার্টমেন্টে বাস করতে লাগলেন। তাঁকে ভর্তি করা হলো সমুদ্রতটের একটি হাই স্কুলে। সেখানে তিনি ছিলেন একজন উজ্জল প্রতিভাধর কিন্তু কম স্কুলে আসা ছাত্র।

অবশেষে তিনি আরবানা-শ্যাম্পেনের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। কিন্তু তাঁর পালক মায়ের মৃত্যুর পর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনাও ছেড়ে দিলেন মাত্র দ্বিতীয় বর্ষে এসে। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী তাঁর পালক বাবা ছিলো অত্যন্ত অসহযোগী একজন মানুষ যার ল্যারির প্রতি কোন আকষর্ণই ছিল না কিন্তু অন্যদিকে তাঁর পালক মায়ের তার প্রতি ভালবাসা ছিল অফুরান। এরপর তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন কিন্তু সেখানেও পড়া শেষ করতে পারলেন না। অবশেষে পড়াশুনার চেষ্টা বাদ দিয়ে তিনি ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে গেলেন।

ল্যারি অ্যালিসনের আরবানা-শেম্পেনের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া শেষ হলো না আজও। কলেজ ড্রপআউট সফল ব্যক্তিদের তিনি একজন হয়ে গেলেন

১৯৭০ সালে অ্যালিসন অ্যামপেক্স করপোরেশনে কাজ শুরু করলেন। সেখানে তাঁর একটি কাজ ছিল আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-এর জন্য একটি ডাটাবেইজ সিস্টেম তৈরী করা এবং এই প্রকল্পের নাম ছিল ‘‘ওরাকল’’।

কড নামের এক ডাটাবেইজ বিশেষজ্ঞের লেখা একটি পেপার অ্যালিসনের খুব পছন্দ হলো। এটি ছিল রিলেশনাল ডাটাবেইজের উপর। একটি গবেষণাপত্র। ১৯৭৭ সালে নিজের ২০০০ ডলার বিনিয়োগ করে অ্যালিসন স্থাপন করলেন একটি কোম্পানী যার নাম রাখা হলো ‘‘সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ল্যাবরেটরী’’। পরবর্তীতে ১৯৭৯ সালে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ‘‘রিলেশনাল সফটওয়্যার ইনক এবং সর্বশেষে ‘‘ওরাকল’’।

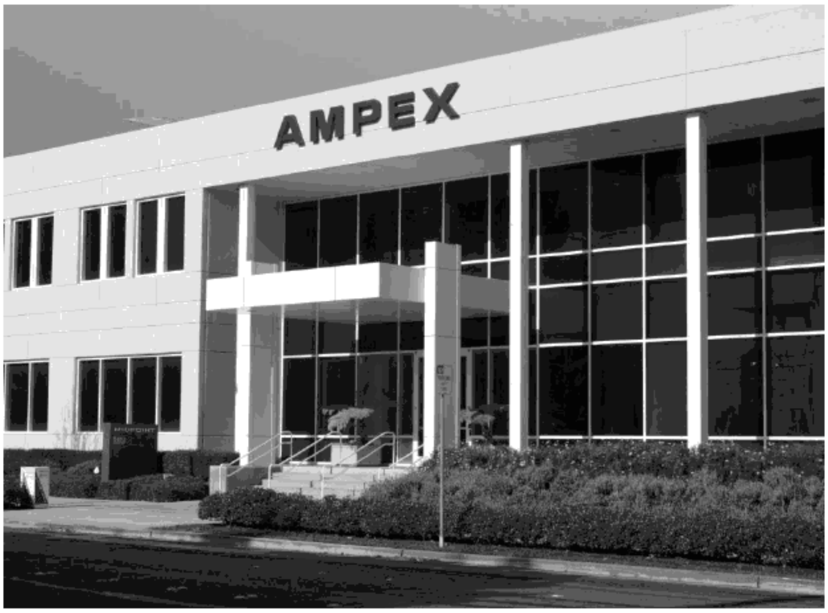

১৯৭০ সালে অ্যালিসন অ্যামপেক্স করপোরেশনে কাজ শুরু করলেন। সেখানে তার একটি কাজ ছিল আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-এর জন্য একটি ডাটাবেইজ সিস্টেম তৈরী করা এবং এই প্রকল্পের নাম ছিল ‘‘ওরাকল’’

এ পর্যায়ে জেনে রাখি, সাম্পর্কিক ডাটাবেস (ইংরেজি ভাষায়: Relational database) হল ডাটাবেসের সাম্পর্কিক মডেল অনুসরণ করে তৈরি করা ডাটাবেস। সাম্পর্কিক ডাটাবেস বলতে ডাটাবেসের

উপাত্ত ও স্কিমা-কে বোঝায়, ডাটাবেস রক্ষণাবেক্ষণকারী সফটওয়্যার, যা সাম্পর্কিক ডাটাবেস ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা (Relational Database Management System) নামে পরিচিত, তাকে বোঝায় না। এর ইংরেজি পরিভাষা relational database প্রথম সংজ্ঞায়িত করেন ও প্রচলন করেন এডগার কড। অ্যালিসন শুনেছিলেন যে, আইবিএম কোম্পানীর ডাটাবেইজ সিস্টেমও কডের তত্ত্বকে (Edgar F. Codd Theory) মেনে চলে।

তাই তিনি চাইলেন তার নিজের তৈরী ডাটাবেইজকেও (যেটিও এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে তৈরী করা হয়েছে) আইবিএম-এর ডাটাবেইজ DB2 এর সাথে কম্পিটেবল করে তৈরী করতে। কিন্তু পারলেন না। কারণ আইবিএম ইচ্ছাকৃতভাবে এতে ছিল ভুল বা এরর কোড রেখে দিয়েছিল।

এখানে বলে নেয়া ভালো, এডগার এফ কড (আগস্ট ২৩, ১৯২৩- এপ্রিল ১৮, ২০০৩) ছিলেন একজন ইংরেজ কম্পিউটার বিজ্ঞানী। সম্পর্কভিত্তিক ডেটাবেজ তত্ত্বে অসামান্য অবদান রাখার জন্য তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন। আইবিএম এর জন্য কাজ করার সময়কালে তিনি ডেটাবেজ ব্যবস্থাপনার সাম্পর্কিক মডেল উদ্ভাবন করেন।

তিনি কম্পিউটার বিজ্ঞানে অন্যান্য আরো অনেক কৃতিত্ব রেখে থাকলেও, ডেটাবেজ ব্যবস্থাপনার জন্যে তাঁর দেয়া সাধারণীকৃত তত্ত্বটিই তাঁর শ্রেষ্ঠতম অবদান হিসাবে পরিচিত হয়ে আছে। ১৯৮১ সালে এই অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে টুরিং পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

যাইহোক, শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে তিনি তার ওরাকল-২ ডাটাবেজ স্বাধীনভাবেই বাজারে ছাড়লেন। যদিও ওরাকল-১ বলে কখনও কিছু ছিল না এর নামের পাশে দুই লেখার উদ্দেশ্য ছিল যে, সমস্ত ভুল কোড এই ডাটাবেইজ হতে দূর করা হয়েছে।

১৯৯০ সালে ওরাকল কোম্পানী একটি বিশাল ভুল করলো। তারা একটি সমন্বিত ডাটাবেইজ সফটওয়্যার বের করলো যার দাম ছিল খুব বেশি তাই অনেক কিছু থাকলেও ক্রেতাদের এটি পছন্দ হলো না। কারণ কার্যক্ষমতার দিক হতে এটি বিশেষ সুবিধার ছিল না। ফলে ওরাকল কোম্পানী শেষ পর্যন্ত প্রায় চারশ কর্মী ছাটাই করতে বাধ্য হলো।

ল্যারি অ্যালিসনের ওরাকল করপোনরশনের হেড কোর্য়াটার- সিলিনডার আকৃতি এই বিল্ডিংগুলোকে ডাটাবেইজের সাথে তুলনা করা যেতে পারে

যদিও মেইনফ্রেম কম্পিউটারে ডাটাবেইজের জন্য আইবিএমের ডিবি-২ বিখ্যাত। তারপরও বাজারে এটি আসতে দেরী হওয়ায়। ওরাকলের জন্য নতুন পথ খুলে গেল। কিন্তু তখনও প্রযুক্তিগতভাবে ওরাকল অপর প্রতিদ্বন্দ্বী ডাটাবেজ সাইবেজের পেছনে পরে ছিল। ঠিক তখনই সাইবেজের একটি ভুল সিদ্ধান্ত ওরাকলকে এগিয়েছিল বহুদূর। সেটি হলো সাইবেজ তাদের কিছু সংরক্ষিত কোড মাইক্রোসফটকে ব্যবহার করতে দিল। ফলে যা হবার তাই, মাইক্রোসফট সেটি দিয়ে এমএস এসকিউএল সার্ভার তৈরী করলো।

ল্যারি অ্যালিসনের ওরাকল করপোনরশনের লোগো নিয়ে আকাশে বিমান

১৯৯৪ তে ইনফরমিক্স সফটওয়্যার সাইবেজ কিনে নিয়ে এর ডেভেলপমেন্ট শুরু করলে তা আবার ওরকলের জন্য বিপদ হয়ে দেখা দিল। ফলে শুরু হলো ওরাকলের ল্যারি অ্যালিসনের সাথে সাইবেজের প্রধান ফিল হোয়াইটের দ্বন্দ্ব। তাদের এই দ্বন্দ্ব সিলিকন ভ্যালীতে বেশ জমে উঠেছিল। অবশেষে ১৯৯৭ এ এসে ওরাকল সাইবেজকে হারিয়েই দিল। কারণ, সেই সময়টা ছিল অ্যাপলের স্টিভ জবসের ফিরে আসার সময়। তিনি ওরাকলের বোর্ড অব ডিরেক্টরস এ যোগ দিলেন। শেষ পর্যন্ত ইনফর্মেক্স এর প্রধান ফিল হোয়াইটকে যুদ্ধে হেরে জেলেই যেতে হলো। সবাইকে হারিয়ে ওরাকল যখন পুরো মার্কেটের দখল নিল তখন বাকী থাকলো শুধু মাইক্রোসফটের এসকিউএল ও আইবিএমের ডিবি-২। যাদের সাথে ওরাকলের এখনও যুদ্ধ করতে হচ্ছে।

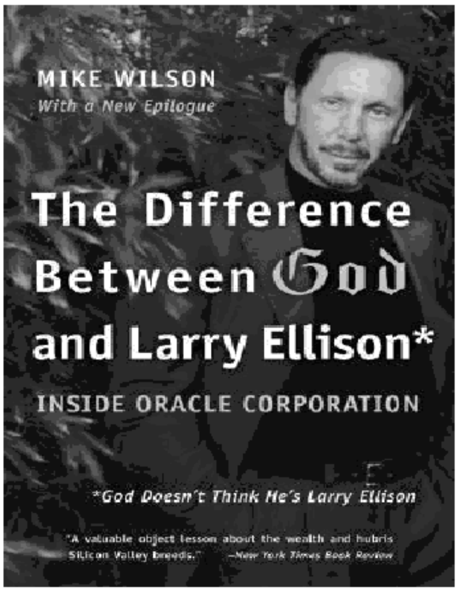

ঈশ্বরের সাথে তার ক্ষমতার ও বুদ্ধিমত্তার তুলনা করে ওরাকল কপোরেশনের ল্যারি অ্যালিসনকে নিয়ে লেখা হয়েছে বই

ব্যক্তিগত জীবনে অ্যালিসন বর্তমানে ১৮.৪ বিলিয়ন ডলারের মালিক। তাঁকে নিয়ে লেখা হয়েছে বই ‘‘দ্যা ডিফারেন্স বিটুইন গড এন্ড ল্যারি ইনসাইট ওরাকল কপোরেশন (*The Difference Between God and Larry Ellison*)’’। ঈশ্বরের সাথে তাঁর ক্ষমতার ও বুদ্ধিমত্তার তুলনা করে ওরাকল কপোরেশনের ভেতরকার তথ্য এতে লেখা হয়েছে। যদিও আরও বলা হয়েছে, ইশ্বর অবশ্য নিজেকে অ্যালিসন ভাবেন না।

''রাইজিং সান'', এটিই পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম ইয়ট যার মালিক ওরাকল কর্পোরেশনের ল্যারি অ্যালিসন

২০০৩ সালে অ্যালিসন বিয়ে করে উপন্যাসিকা মেলানি ক্রাফটকে। তাঁর বিয়েতে অ্যাপলের স্টিভ জবস অফিসিয়াল ফটোগ্রাফারের দায়িত্ব পালন করেন। এটি ছিল তাঁর চতুর্থ বিয়ে।

সম্পদের প্রাচুর্য্য তাঁর জীবনের সঙ্গী। তিনি এর বহিঃপ্রকাশেরও পক্ষে। তাই তিনি কিনেছেন বিশাল এক ইয়ট। যার নাম ''রাইজিং সান'', এটিই পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম ইয়ট।

তাঁর রয়েছে ব্যক্তিগত জেট বিমান ২০০ মিলিয়ন ডলারের বিশাল এক জাপানী নির্মাণশৈলীতে তৈরী প্রাসাদ। কৃত্রিম হ্রদ। ব্যক্তিগত সমুদ্র সৈকত প্রভৃতি।

ওরাকল কর্পোরেশনের স্পন্সরে বিখ্যাত ওরাকল পাল তোলা

বোট রেস অনুষ্ঠিত হয় আমেরিকাতে প্রতি বছর

দাতা হিসেবে অ্যালিসনের ভূমিকা উল্লেখ্য- তিনি সন্ত্রাসী হামলার বিপক্ষে কাজ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকাকে বিনামূল্যে সফটওয়্যারের যোগান দেন। এছাড়া তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদের ১% দান করে ফোর্বস ম্যাগাজিনের দাতাদের তালিকায় নাম উঠান। যার মূল্যে ছিল ১৫১,০৯২,২০৩ ডলার। কিন্তু ২০০৬ সালে তাঁকে অভিযুক্ত হতে হয় হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়েকে দেয়া কথা না রাখার জন্য এবং যথেষ্ট অনুদান না দেওয়ার জন্য। তাঁর একটি প্রিয় উক্তি হলো- ''আমি মানুষের প্রশ্নের ফ্যাশনেবল উত্তর দিতে পছন্দ করি না।''

গুগলের সহ নির্মাতা- ল্যারী পেইজ (Larry Page)

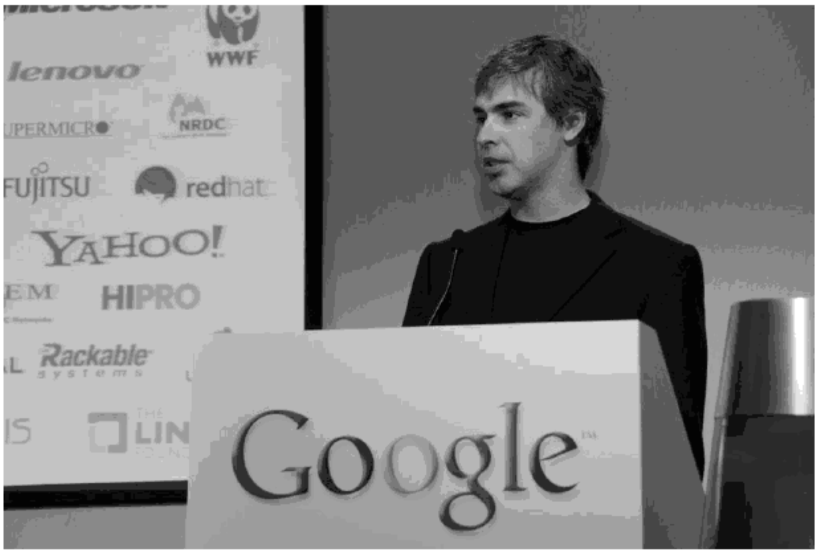

ল্যারী পেইজের পুরো নাম- লরেন্স এডওয়ার্ড ল্যারী পেইজ। জন্ম ১৯৭৩ সালের ২৬শে মার্চ। পেইজ তাঁর বন্ধু সার্গেই ব্রিনের সাথে মিলে নির্মান করেন সর্বকালের সেরা ইন্টানেট সার্চ ইঞ্জিন Google.com এবং স্থাপন করেন গুগল ইনকোর্পোরেট। বর্তমান তিনি এই কোম্পানীর পণ্য ও বিপণন বিভাগের প্রধান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন এবং তাঁর মোট সম্পদের পরিমান ১৫.৮ বিলিয়ন ডলার।

ল্যারী পেইজের বাবাও কিন্তু বিখ্যাত কম্পিউটারবিদ ড. কার্ল ভিক্টর পেইজ যিনি মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার বিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং তাঁর মা গ্লোরিয়া পেইজের কম্পিউটার দক্ষতা রয়েছে। তিনিও একই বিশ্ববিদ্যায়লে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং শেখান।

এমন বাবা মায়ের ছেলে যে একদিন কম্পিউটার দুনিয়াতে বিশাল কাজ করবে, তাতো বোঝাই যায়। কম্পিউটার প্রেমিক এই দম্পতির তাই গর্বের শেষ নেই।

পেইজের পড়াশুনার শুরু মন্টেসরি হাই স্কুলে এবং স্নাতক শেষ করেন ইস্ট ল্যানসিং হাই স্কুল হতে। এরপর ভর্তি হন মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সর্বশেষে বিশ্ববিখ্যাত স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখান থেকে তিনি কম্পিউটার বিজ্ঞানে মাস্টার্স ডিগ্রী শেষ করলেও পিএইচডি করা আজও শেষ হয়নি। অসীম সময়ের জন্য জন্য তা পিছিয়েছে গুগলে তাঁর অধিক ব্যস্ততার কারণে। জানা যায় তিনি গেইটস কম্পিউটার সাইন্স বিল্ডিং এ কাজ করতেন স্ট্যানফোর্ডে।

ল্যারী গেইটস কম্পিউটার সাইন্স বিল্ডিং এ কাজ করতেন স্ট্যানফোর্ডে

যাই হোক, ল্যারী পেইজ যখন স্টানফোর্ডের পিএইচডি গবেষণায় ব্যস্ত তাঁর সাথে দেখা হলো আরেক মেধাবী কম্পিউটারবিদ সার্গেই ব্রিনের। দুজন মিলে গবেষণা করতে শুরু করলেন ইন্টারনেট সার্চ ইঞ্জিন নিয়ে। যার কাজ হলো অনলাইনের তথ্য সমূদ্র হতে তথ্য অনুসন্ধান করা এবং অনুসন্ধানকারীর কাছে দ্রুত পৌছে দেয়া সম্পূর্ণ বিনামূল্যে।

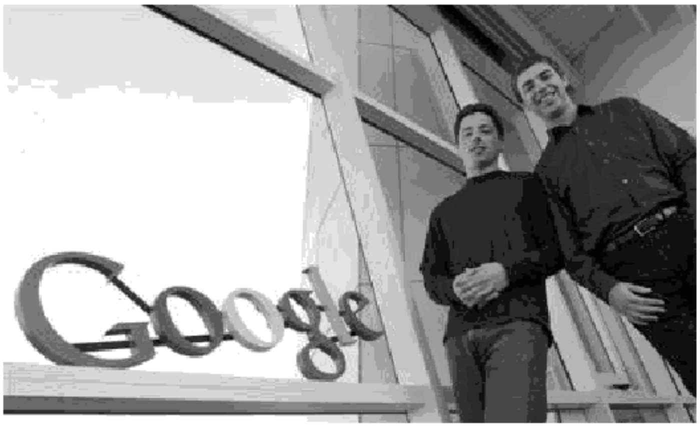

মাত্র ১৯৯৮ সালে তাদের তৈরী এই সার্চ ইঞ্জিন আজ বিশ্বের এক নম্বর অনুসন্ধান ইঞ্জিন

গুগল অনুসন্ধান ওয়েবের বৃহত্তম অনুসন্ধান ইঞ্জিন। গুগলের লক্ষ্য বিশ্বের যাবতীয় তথ্য সুবিন্যস্ত করা এবং সেগুলো সর্বসাধারণের জন্য উপযোগী করে প্রকাশ করা। *(Organize the world's information and make it universally accessible and useful.)* গুগল প্রতিদিন তার বিভিন্ন সেবার মাধ্যমে প্রায় ২০ কোটি অনুসন্ধানের অনুরোধ গ্রহণ করে। অনেক বড় বড় কোম্পানী এমনকি মাইক্রোসফট এটিকে অধিগ্রহণ করতে চাইলেও তারা কখনই মাথা নত করেনি।

এবার আসুন আমরা জেনে নিই, গুগলের কিছু অসাধারণ সর্ভিসের কথা, একটা ওয়েবসাইটের গুরুত্ব অনুমান করা যায় অনেকটা তার গুগল পেজর‌্যাঙ্ক দেখে। গুগলের কাছে সারা দুনিয়ার ওয়েবসাইটের ডেটা

আছে। কোন সাইট অন্য কোন সাইটের সাথে লিংক করা সেটাও তার নখদর্পণে। এসব থেকে গুগল একটা ওয়েবসাইটের (আসলে প্রতিটি পৃষ্ঠার) গুরুত্ব পরিমাপ করে, এটাই পেজর‍্যাঙ্ক। পেজর‍্যাঙ্কের মান ১ থেকে ১০ পর্যন্ত (ননলিনিয়ার) হতে পারে। ঠিক কী পদ্ধতিতে পেজর‍্যাঙ্ক হিসেব করা হয় যদিও তা গুগল গোপন রেখেছে, তবে অনেকে ধারণা করে ভাল র‍্যাঙ্কের জন্য জানা চাই, কতগুলো সাইট সেটাকে লিংক দিয়েছে, লিংকপ্রদানকারী সাইটগুলোর নিজেদের পেজর‍্যাঙ্ক, সাইটের আইপির কলাস (+ডোমেইন সাফিক্স), লিংকপ্রদানকারী সাইটগুলোর আইপির কলাস (+ডোমেইন সাফিক্স), সাইটের বয়স (কতদিন ধরে চলছে), সাইটের তথ্যের গুণগত মান, এসব কিছু গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, .edu ডোমেইনের পেজর‍্যাঙ্ক অধিকাংশ সময়ই তুলনামূলকভাবে বেশী। .tk এর কোন পেজর‍্যাঙ্ক নেই বললেই চলে! তবে, সময়ের সাথে, পেজর‍্যাঙ্ক বাড়তে বা কমতে পারে। ৫ বা এর বেশী পেজর‍্যাঙ্ক হলে সাধারণত একটা সাইটকে গুরুত্বপূর্ণ/জনপ্রিয় ধরা যায়। গুগলের পেজর‍্যাঙ্ক দেখে জানার উপায় নেই একটা সাইটে প্রতিদিন কতজন দেখতে আসে। এটি কেবল গুগল এনালাইটিকস থেকে সংশ্লিষ্ট সাইটের কর্তার পক্ষেই জানা সম্ভব। [5]

তবে গুগলের অসংখ্য সার্ভিসের ভেতর গুগল সার্চই অন্যতম। কি আসে না গুগল সার্চে? আপনি এমনও ভাবতে পারেন যদি কোন দিন নিজের বাসার ঠিকানা ভুলে যান তাহলে রাস্তার পাশের কোন সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে সার্চ দিলে মনে হয় যেন পেয়ে যাবেন আপনি বাসার ঠিকানাও!

গুগলের যুদ্ধ এখন উইকিপিডিয়ার সাথে

গুগল এই যে এতো কিছু সার্চ করে আনে এটা গুগলের ক্রেডিট কিন্তু গুগল সার্চ ফলাফলগুলো দেখায় বিভিন্ন সাইটের লিঙ্ক আর কিছু নিজের ক্যাশ, আর্কাইভ থেকে। যেমন যে কোন তথ্যের জন্য অনলাইনে উইকিপিডিয়া হলো অন্যতম। গুগল সার্চে প্রায় দেখা যায় উইকিপিডিয়ার লিংক আগে থাকে। গুগল বট (সার্চ রোবট) ব্যবহার করে উইকি সহ প্রায় জনপ্রিয় বেশির ভাগ সাইট (হিট বা গুগল র‍্যাংক এর প্রাধান্য অনুসারে) প্রায় প্রতিদিন ইনডেক্স করে। এখন যদি এমন হয় উইকির মতো সব তথ্য গুগলের নিজের থাকবে তাহলে কেমন হবে ? হ্যাঁ গুগল ঠিক সেই ধরনের একটা কাজ করতে যাচ্ছে। গুগলের একদম সাম্প্রতিক প্রজেক্টের নাম ‘গুগল নোল (Google Knol)’।

নোল হল একটা ফ্রি টুল যার আভিধানিক অর্থ হলো জ্ঞানের একক। গুগল যা করবে তা হলো লেখকদের বিভিন্ন টপিক নিয়ে লেখার জন্য অনুরোধ করবে। এই জন্য গুগল লেখকের নাম উল্লেখ (যা সাধারনত করা হয়না) সহ তাদের জন্য সম্মানীর ব্যবস্থা করবে। লেখালেখিজনিত কোন কাজ গুগল করবে না তবে লেখা, সম্পাদনা ইত্যাদি করার জন্য সহজ টুল সরবরাহ করবে যার নাম নোল। নোলের তথ্য যে কোন বিষয়ের হতে পারে আর এটি সবাই ব্যবহার করতে পারবে ফ্রি। তথ্যও সবার জন্য হবে উন্মুক্ত। উইকির মতো নোল কমিউনিটির ব্যবস্থা করবে মানে লেখার উপর মন্তব্য, সম্পাদনা ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকবে। উইকির সাথে এর অন্যতম পার্থক্য হবে উইকিতে কোন বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় না।

কিন্তু নোলে কোন নির্দিষ্ট টপিকে ঐ টপিক সম্পর্কিত বিজ্ঞাপন দেবে গুগল যার আয় থেকেই একটা অংশ পাবে ঐ টপিকের লেখক। এতে করে একই সাথে লেখকগন ও গুগল উভয়েই উপকৃত হবে। উইকিপিডিয়া উইকিতে গুগলের এড দিতে রাজি হয়নি। এমনকি সম্প্রতি উইকিপিডিয়া তাদের উইকিয়া (এটা নন প্রফিট নয়) প্রকল্পের মাধ্যমে গুগলের মতো কার্যকরি সার্চ ইঞ্জিনও প্রকাশ করতে যাচ্ছে। অবশ্য এতে

গুগলের তেমন কোন ক্ষতি হবে না। তবে গুগল কখনই আগে তার কোন প্রজেক্ট মোটামুটি শেষ হবার আগে ঘোষণা দেয়নি যা এবার দিয়েছে এবং এটা যে উইকিপিডিয়ার সাথে একটা ঠান্ডা যুদ্ধ ঘোষণা তা হয়তো বলা যায়।

একটা ব্যাপার হলো গুগল সার্চ ইঞ্জিন দিয়ে ব্যবহারকারীকে তখন সন্তুষ্ট করতে পারে যখন সার্চ রেজাল ব্যবহারকারীর যা দরকার তার কাছাকাছি চলে আসে।

আর এই কাজে উইকিপিডিয়ার ভান্ডার গুগলকে দিয়ে আসছে অন্য রকম সহযোগিতা। নোলকে অনেকেই অবিহিত করছেন স্কলারপিডিয়া নামে। [6]

দেখা যাক গুগলের নোল উইকিপিডিয়ার সাথে পাল্লাতে মেতে উঠছে নাকি ভিন্ন ধারার তথ্য ভান্ডার নিয়ে আসছে যেখানে এক সাথে সার্ভিস প্রোভাইডার, তথ্য দানকারী, তথ্য অনুসন্ধানকারী সবাই উপকৃত হবে।

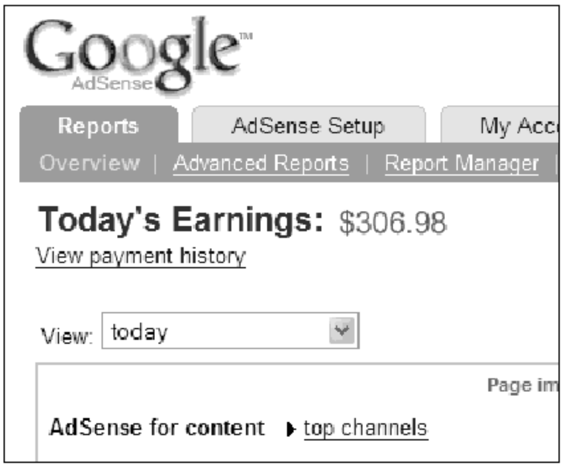

গুগল অ্যাডসেন্স এমন একটি সেবা যার মাধ্যমে গুগল আপনার নিজস্ব ওয়েব বা ব্লগসাইটে টার্গেটেড বিজ্ঞাপণ সরবরাহ করে এবং ভিজিটরের ক্লিক ও সাইট ভিউ এর উপর ভিত্তি করে আপনাকে টাকা প্রদান করে থাকে।

অনলাইন জায়ান্ট বা অনলাইন দৈত্য বলে খ্যাত গুগলের অসাধারণ সব সার্ভিসের মধ্যে অন্যতম ও জনপ্রিয় একটি সার্ভিস হচ্ছে গুগল অ্যাডসেন্স। যারা ইন্টারনেট ব্যবহার করেন বা এর সাথে জড়িত, তাদের সবাই-ই কমবেশী গুগল অ্যাডসেন সম্পর্কে জানেন। গুগল অ্যাডসেন্স এমন একটি সেবা যার মাধ্যমে গুগল আপনার নিজস্ব ওয়েব বা ব্লগসাইটে টার্গেটেড বিজ্ঞাপণ সরবরাহ করে এবং ভিজিটরের কিলক ও সাইট ভিউ এর উপর ভিত্তি করে আপনাকে টাকা প্রদান করে থাকে। অসাধারণ এই সার্ভিসটি ব্যবহার করে বিশেবর লক্ষ লক্ষ মানুষ উপকৃত হচ্ছেন।

২০০১ সাল পর্যন্ত ল্যারী এবং সার্গেই ব্রিন মিলে গুগল বানালেও এখন এটির অপর চালক এরিক স্কিমিদিত। বলা চলে গুগল চলে এখন ল্যারী পেইজ, সার্গেই ব্রিন এবং এরিকের নেতৃত্বে।

PAGE GIRL

Google guy and ladyfriend have good reasons for 'feeling lucky'

EXCLUSIVE

Stanford grad student Lucy Southworth, 26, is believed to be the love interest of Google's Larry Page (inset).

লুসি সাউথ ল্যারী পেইজকে বিয়ে করতে গেলে হয়ে যান পত্রিকার গরম খবর

বিশ্বের ২৭তম ধনী এই তরুণ কম্পিউটারবিদ সাম্প্রতিককালে একটি বোয়িং ৭০৭ বিমানের মালিকও হয়েছেন। এটি তাঁর কোম্পানীর কাজে ব্যবহার করেন। এর নাম দিয়েছেন ''পার্টি এয়ার প্লেন''। কারণ এতে রয়েছে আমোদ প্রমোদের সব উপকরণ। যদিও এটি বিখ্যাত ডিজাইনার লেসলি জেনিংস এর দ্বারা নতুন করে সাজানোর কথা ছিল কিন্তু তা কিছু জটিলতার কারণে বন্ধ রয়েছে। নতুন ভাবে সাজানো হলে এর সাথে যুক্ত হবে বিশাল একটি সাইজ ক্যালিফোর্নিয়া বেড।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম ল্যারী পেইজকে আগামী দিনের গ্লোবাল লিডার হিসেবে নির্বাচিত করেছে। ইন্টারনেট সার্চ ইঞ্জিনের উপর তাঁর রয়েছে অসংখ্য গবেষণা পত্র। ২০০৭ এর ডিসেমবরের তিনি লুসি সাউথকে বিয়ে করেন।

মাইক্রোসফট এর
বিল গেইটস (William Henry "Bill" Gates III)

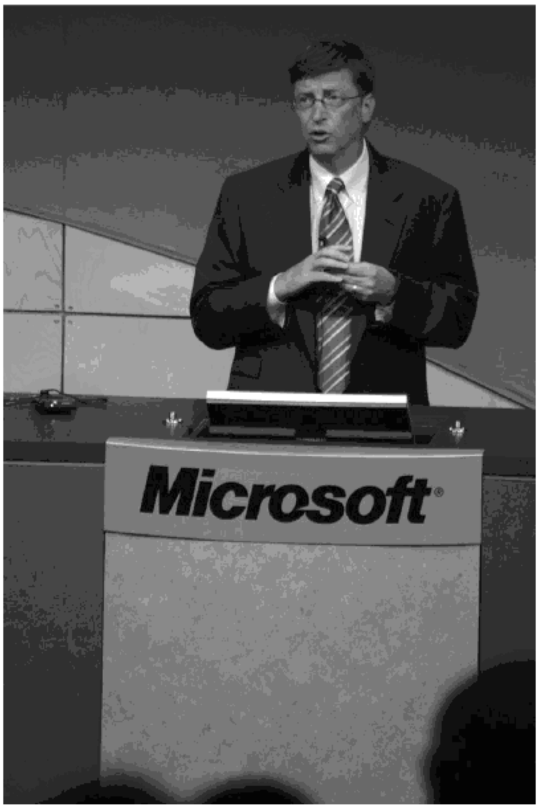

তার পুরো নাম উইলিয়াম হেনরী গেইটস-৩। জন্ম ২৮শে অক্টোবর, ১৯৫৫ সালে। আমেরিকার সিয়াটল শহরে। তিনি একাধারে বিশ্বের এক নম্বর সফটওয়্যার নির্মানকারী প্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফট এর সহ প্রতিষ্ঠাতা। প্রাক্তন প্রধান সফটওয়্যার আর্কিটেক্ট এবং প্রাক্তন প্রধান নিবার্হী কর্মকর্তা। আর সেই সাথে করবিজ নামের একটি ডিজিটাল ছবি সংরক্ষনকারী প্রতিষ্ঠানেরও নির্বাহী তিনি। ফোবর্স ম্যাগাজিনের দৃষ্টিতে বিগত ১২ বছর যাবৎ তিনিই পৃথিবীর ধনীতম ব্যক্তি। ১৯৯৯ সালে তাঁর ধন-সম্পত্তির পরিমান ১০০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যায়। তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ৫৩ বিলিয়ন ডলার (ফোবর্স ২০০৬)। তাঁর পরিবার বিশ্বের দ্বিতীয় ধনীতম পরিবার যেখানে বিশ্বের এক নম্বর ধনী পরিবার হলো ওয়ালটন পরিবার।

বিল গেইটস টাইম ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে

বিল গেইটস তথ্য প্রযুক্তির দুনিয়ার সর্বাধিক পরিচিত একটি নাম। তাঁর দূরদর্শিতা এবং উচ্চকাংখার জন্য তিনি প্রবলভাবে নন্দিত এবং নিন্দিতও বটে। তাঁকে বার বার আইনের সাথে লড়তে হয়েছে অনৈতিক বাণিজ্য এবং ছোটখাট উদ্যোক্তাদের সাথে দৈত্য সাদৃশ্য আচরণের জন্য। কিন্তু তিনি তার মোট সম্পদের ৫২% দান করে দিয়ে তিনিই বনে গেছেন বিশ্বের এক নম্বর দাতা। ২০০০ সালে স্থাপিত বিল এবং মেলিন্ডা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে তিনি তাঁর অর্জিত অর্থ বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে দিয়ে থাকেন।

শুধু তাই নয় ২০০৬ সালে ১৬ই জুন তিনি ঘোষণা দেন যে মাইক্রোসফট হতে সরে এসে তিনি তাঁর দাতব্য প্রতিষ্ঠান বিল ও মেলিন্ডা ফাউন্ডেশনের পূর্ণ হাল ধরবেন ও ২০০৮ সাল হতে নিবেদিতপ্রাণভাবে বিশ্ববাসীর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করবেন এবং করেনও তাই।

মানবতাবাদী উদ্যোগের জন্য টাইম ম্যাগাজিন ২০০৬ সালের সেরা ব্যক্তিত্ব হিসেবে নির্বাচন করে বিল গেইটস, মেলিন্ডা গেইটস এবং ৩২ ব্যান্ডের গায়ক বোনোকে, যিনি বিনের পয়সায় বিভিন্ন দাতব্য কনসার্টের আয়োজন করে থাকেন।

ব্রিটেনের রানী তাকে সম্মান সূচক নাইট উপাধি প্রদান করে।

এবার আসি বিলের ছোট্ট বেলার কথায়, কম্পিউটারপ্রেমী এই মানুষটির জন্ম ওয়াশিংটনের সিয়াটল শহরে। বাবা উইলিয়াম হেনরী গেইটস এবং মা মেরী ম্যাক্সোয়েল গেইটস। তাঁদের পরিবারটি আগে থেকেই ছিল বেশ ধনী। বিলের বাবা প্রখ্যাত আইন বিশেষজ্ঞ এবং মা ফার্স্ট ইন্টারস্টেট ব্যাংকের একজন অন্যতম পরিচালক।

বিল গেইটসকে ভর্তি করা হলো সিয়াটলের এক নামী বেসরকারী স্কুলে
স্কুলটির নাম ছিল লেকসাইড প্রিপারেটরী স্কুল

ছোটবেলার বিল গেইটসকে ভর্তি করা হলো সিয়াটলের এক নামী বেসরকারী স্কুলে। স্কুলটির নাম ছিল লেকসাইড প্রিপারেটরী স্কুল যার বেতন ছিল বছরে ৫০০০ ডলার (সে সময়ে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বাৎসরিক ফি ছিল মাত্র ১৭৬০ ডলার)।

সেই স্কুলটি কম্পিউটার সেন্টার কর্পোরেশন হতে একটি DEC PDP-10 কম্পিউটার ভাড়া করে নিয়ে আসলো। সৌভাগ্যবসত বিল গেইটস এবং তার কয়েক বন্ধু সেটি ব্যবহার করার সুযোগ পেলেন। শর্ত ছিল এর সফটওয়্যারের সমস্যা ও ভুলগুলো তাঁরা চিহ্নিত করতে সহায়তা করবেন। কিন্তু কিছুদিন পর তাঁদের এই সুযোগটি আর রইলো না।

তবে অন্য এক সুযোগ এলো- ইনফর্মেশন সাইন্সেস নামের এক প্রতিষ্ঠান লেকসাইডের কিছু ছাত্রকে নিয়োগ করতে চাইলো কোবল (COBOL) প্রোগ্রামিং ডাটা ব্যবহার করে একটি পে-রোল প্রোগ্রাম তৈরীর কাজে। এর ফলে বিল শুধুই যে কম্পিউটারে কাজ করার সুযোগ পেলেন তা নয় সেই সাথে এলো বেশ কিছু টাকা।

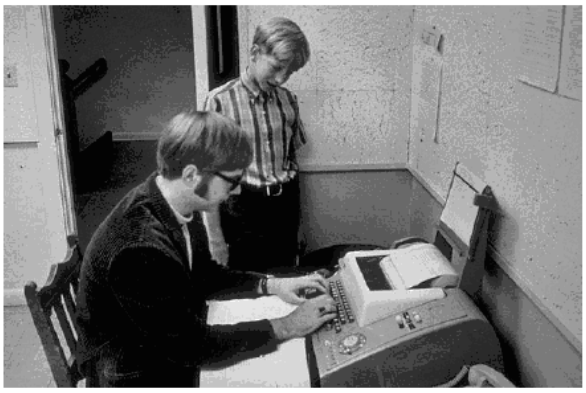

বিল গেইটস এবং তাঁর কয়েক বন্ধু সেটি ব্যবহার করার সুযোগ পেলেন লেকসাইড প্রিপারেটরী স্কুলের কম্পিউটারে

এরপর এলো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পালা, বিল SAT পরীক্ষায় পেলেন ১৫৯০। যা অবশ্যই একটি চমৎকার স্কোর। অন্যদিকে মাইক্রোসফটের অপর সহ-নির্মাতা পল অ্যালান পেয়েছিলেন ১৬০০। যা তাঁদের দুজনকে হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটার বিজ্ঞানে ভর্তির সুযোগ এনে দেয়। সেখানে পেয়ে যান মাইক্রোসফটর অপর বিজনেস পার্টনার স্টিভ বালমারের দেখা।

বিল গেইটস ও স্টিভ বালমারের দেখা

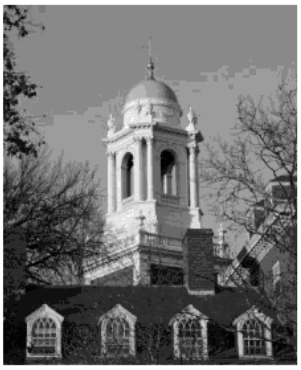

বিল গেইটস হারভার্ডের পড়া শেষ না করেই মাইক্রোসফট বানালেন

কিন্তু ৩০ বছর পর বিল গেইটস হারভার্ডের ডিগ্রী পেয়েছিলেন

এবার এলো মাইক্রোসফট তৈরী পালা। ১৯৭৫ সালে এমসাইটিএস নামের একটি কোম্পানী বিলকে অনুরোধ করলো অল্টিয়ার-৮৮০০ নামক একটি মাইক্রো কম্পিউটারের জন্য বেসিক প্রোগ্রাম ভাষা তৈরী করে দিতে।

তরুন বিল গেইটস

অপরাধী বিল গেইটস

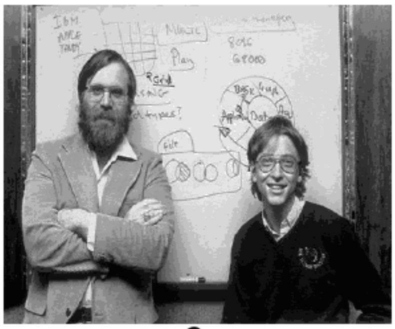

পল অ্যালেন ও বিল

প্রথম মাইক্রোসফট পরিবার

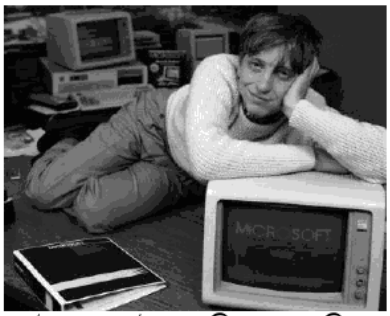

মাইক্রোসফট এর বিজ্ঞাপনে বিল

খেলায় মত্ত বিল গেইটস

বিল গেইটস এর দুলর্ভ কিছু ছবি

কিছু দিনের মধ্যে বিল গেইটস এবং পল অ্যালেন মিলে এটি তৈরী করে ফেলেন। ফলশ্রুতিতে ঐ কোম্পানীটি তাঁদের সাথে সফটওয়্যার বিনিময়ের একটি চুক্তি তৈরী করলো। আর অন্যদিকে বিল আর পল দু'জন মিলে তৈরী করলেন মাইক্রোসফট নামক একটি সফটওয়্যার উৎপাদনকারী সংস্থা। অচিরেই তাঁরা হারভার্ড ছাড়লেন এবং পূর্ণ উদ্যোমে সফটওয়ার তৈরীর এবং বিপণনের কাজ শুরু করলেন। প্রথম থেকেই মাইক্রোসফট উন্মুক্ত সোর্স কোড প্রোগ্রামের বিপক্ষে এবং বিনামূল্যে সফটওয়ার সংগ্রহকে তাঁরা বল্লেন, পাইরেসি বা সফটওয়্যার ডাকাতি। এর জন্য সকলকে সচেতন করতে সচেষ্ট হলো। ১৯৮০ সালে আইবিএম সংস্থা মাইক্রোসফটকে অনুরোধ জানালো তাদের নতুন পারসোনাল কম্পিউটারের জন্য বেসিক প্রোগ্রামিং ডাটা তৈরী করে দিতে। বিল তাদেরকে বুদ্ধি দিল ডিজিটাল রিসার্চ নামক একটি সংস্থার কাছে যেতে যারা

তখন CP/M নামক একটি বিখ্যাত ডিস্ক অপারেটিং সিস্টেম তৈরী এবং বাজারজাত করতো। কিন্তু তাদের সাথে আইবিএম কোম্পানীর চুক্তি হলো না। শেষে তারা আবার ফেরত এলো বিলের কাছে। বিলের বানিজ্যিক বুদ্ধি এবার দারুন কাজ করলো। তৎক্ষনাৎ সিয়াটল কম্পিউটার প্রোডাক্টস নামের কোম্পানীর টিম টিটারসনের কাছ হতে বিল CP/M এর মত একটি অপারেটিং সিস্টেমের লাইসেন্স কিনে তাতে কিছুটা পরিবর্তন করে মাইক্রোসফটের নামে PC-DOS নাম দিয়ে আইবিএমের কাছে বিক্রয় করে দিলেন।

এটিই MS-DOS বা মাইক্রোসফট ডিস্ক অপারেটিং সিস্টেম নামে বিল গেইটস বাজারজাত করতে লাগলেন

মাইক্রোসফট উইন্ডোজ ১.০

মাইক্রোসফট উইন্ডোজ ৩.১

মাইক্রোসফট উইন্ডোজ ৯৫

মাইক্রোসফট উইন্ডোজ মিলনিয়াম

মাইক্রোসফট উইন্ডোজ এক্সপি

মাইক্রোসফট উইন্ডোজ ভিসতা

মাইক্রোসফট উইন্ডোজের লগইন স্ক্রিনের বিবর্তন

পরবর্তীতে এটিই MS-DOS বা মাইক্রোসফট ডিস্ক অপারেটিং সিস্টেম নামে বিল গেইটস বাজারজাত করতে লাগলেন। আর এভাবেই, মাইক্রোসফট শুধু একটি কোম্পানী হতে সফটওয়্যার বাজারের বৃহৎ দৈত্য পরিচিত একটি কোম্পানিতে রূপান্তরিত হতে শুরু করলো। ১৯৮০ এসে অ্যাপল কম্পিউটারের দেখাদেখি মাইক্রোসফটও তাদের অপারেটিং সিস্টেমের গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস ছাড়লো। ১৯৯০ সালে Windows 3.0 বাজারে এলো এবং ১০ মিলিয়ন কপি বিক্রি হলো।

জন্মলগ্ন ১৯৭৫ সাল হতে ২০০৬ সাল পর্যন্ত গেইটসের ভূমিকা মাইক্রোসফটের পন্য উৎপাদন এবং বিপণনের কৌশল নির্ধারনের জন্য প্রচন্ড রকমের সফল হলেও তা যথেষ্ট বিতর্কের সূচনা করে। যুক্তরাষ্ট্রের সরকার তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করে বাজারে মনোপুলি ব্যবসা, অপরকে হুমকির মধ্যে রাখার প্রবনতার জন্য। তাঁর বিরুদ্ধে করা হয় অ্যান্টি ট্রাষ্ট মামলা ১৯৯৮ সালে। কারণ এ সকল সিদ্ধান্তের সবই বিলের নিজের ছিল মাইক্রোসফটকে একটি দৈত্যাকার কোম্পানীতে পরিণত করার লক্ষ্যে বিল গেইটস এধরনের সিদ্ধান্ত নেন। ফলে বাজারের অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীরা মহা সমস্যার মধ্যে থাকে।

আবার অন্যদিকে বিল গেইটস তার অর্জিত সম্পদের বিশাল একটি অংশ দান করেন বিল মেলিন্ডা ফাউন্ডেশনের কাছে বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য ২০০০ সালে।

বিল গেইটস ১৯৯৪ সালে ডালাসের মেলিন্ডাকে বিয়ে করেন

অবশেষে, জুলাই ২০০৮ থেকে বিল গেইটস মাইক্রোসফটে পার্ট টাইম চেয়ারমান ও টেকনিকাল এডভাইজারের রোল প্লে করবেন এবং ফুল টাইম বিল এন্ড মেলিন্ডা ফাউন্ডেশনের হয়ে কাজ করবেন বলে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী মাইক্রোসফট হতে কিছুটা সরে আসেন। আবেগঘন এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নিজ হাতে গড়ে তোলা প্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফটের শীর্ষ পদটি থেকে বিদায় নিনে বিল গেইটস। মাইক্রোসফটের বদৌলতে পৃথিবীর সর্বাধিক ধনী ব্যক্তিত্বে পরিণত হওয়া এই ব্যক্তি এখন থেকে স্ত্রী ও নিজের নামে প্রতিষ্ঠিত সমাজ-সেবামূলক সংগঠন বিল এন্ড মেলিন্ডা গেইটস ফাউন্ডেশনের জন্য বেশি করে সময় দিবেন এখন থেকে। উল্লেখ্য, বিল এন্ড মেলিন্ডা গেইটস ফাউন্ডেশন হচ্ছে বর্তমানে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ চ্যারিটী।

মাইক্রোসফটের প্রধান বিলের চলে যাওয়ার কার্টুন- বিল গেইটস লগস আউট

মাইক্রোসফটের প্রধান অবস্থানটি ত্যাগ করলেও আলঙ্কারিকভাবে সংস্থার চেয়ারম্যান পদটিতে থেকে যাচ্ছেন বিল গেইটস। এছাড়াও সংস্থার সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ারের মালিকানাও তাঁর হাতেই থাকছে। তবে এখন তিনি মাইক্রোসফটের প্রাত্যহিক কাজকর্মে কোনো ভূমিকা রাখবেন না। গেইটসের স্থলে সিইও স্টিভ ব্যালমার। ওয়াশিংটনের রেডমন্ডে মাইক্রোসফটের সদর দপ্তরে দেয়া বিদায়-সংবর্ধনাতে ভাষণদান-কালে বিল গেইটস বলেন, 'আমার জীবনে এমন কোনো দিন আসবে না, যেদিন আমি মাইক্রোসফটের কথা না ভেবে থাকবো।' তাঁর ভাষণের সময় মঞ্চে আরও উপস্থিত ছিলেন সিইও স্টিভ ব্যালমার। গেইটসের হার্ভাড বিশববিদ্যালয়ের সহপাঠী ও বন্ধু ব্যালমার বলেন, 'বিলকে ধন্যবাদ জানানোর কোনো উপায় আমাদের হাতে নেই। বিল হচ্ছে প্রতিষ্ঠাতা। বিল হচ্ছে নেতা।' বিদায়-পর্বটিতে মাইক্রোসফটের স্টাফদের পক্ষ থেকে আসা প্রশ্নগুলোর সরাসরি জবাব দেন বিল গেইটস। বিশ্লেষকদের মতে মাইক্রোসফটকে একাধিক সঙ্কটের মধ্যে রেখেই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিলেন বিল গেইটস। উল্লেখ্য, এ-পর্যন্ত হিসাব ধরলে মাইক্রোসফটের শেয়ারের দাম কমেছে ২১ শতাংশ।

গুগুলের সাথে বাজার দখল নিয়ে মাইক্রোসফটের ইঁদুর-দৌড় চলছে। গুগলের সাথে পাল্লা দেয়ার লক্ষ্যে অপর বৃহৎ কোম্পানী- ইয়াহুকে কিনে নেয়ার ক্ষেত্রেও শেষ পর্যন্ত কোনো কুল-কিনারা করে উঠতে পারেনি মাইক্রোসফট

ব্যক্তিগত জীবনে বিল গেইটস ১৯৯৪ সালে ডালাসের মেলিন্ডাকে বিয়ে করেন। তাঁদের তিন সন্তান জেনিফার, ররি ও ফোবে। বিলের বাড়িটি হলো বিশ্বের অন্যতম বিলাসবহুল একটি বাসস্থান। যার মূল্যে ১২৫

মিলিয়ন ডলার। সম্পূর্ণ কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত এই বাড়িতে আছে লিওনার্ড দ্যা ভিঞ্চির হাতে লেখা বই, গুটেনবার্গেন ছাপানো বাইবেল প্রভৃতি।

বিল গেইটস বিশাল বাসস্থান

গেইটস তাঁর জীবনে যত অর্থ উপার্জন করেন তাঁর এক তৃতীয়াংশ মানব সেবায় দান করে দিয়েছেন। । বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করে। এদের মধ্যে রয়েছে, সুইডেনের রয়াল ইন্সিটিটিউট অব টেকনোলজি, জাপানের ওয়াসেদা ইউনিভার্সিটি প্রভৃতি। ২০০৫ সালে ইংল্যান্ডের রানী তাঁকে সম্মান সূচক নাইট উপাধি দেন। একটি মৌমাছির নামও তাঁর নামে রাখা হয় এরিসটালিস গেটাসি। তিনি হলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি বিশ্বের সর্বাধিক ই-মেইল পেয়ে থাকেন। তাঁকে নিয়ে তৈরী হয়েছে অসংখ্য সিনেমা। নাটক এবং ভিডিও গেইমস। লেখক হিসেবেও বিলের জুড়ি নেই। তাঁর লেখা দুটি বই ''দ্যা রোড অ্যাহেড'' এবং ''বিজনেস অ্যাট দ্যা রেট অব থট'' অনেক আগেই বেস্ট সেলারের মর্যাদা লাভ করেছে। এছাড়া বিশ্বের নামকরা সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকার তিনি ১৯৯৭ সালে হতে লেখালেখি করে আসছেন অসংখ্য প্রবন্ধ। সেগুলোর সবই পাওয়া পাবে *www.microsoft.com/billgates* ওয়েব সাইটে।

তাঁর একটি লেখায় তিনি বলেন, আজকাল ছেলে-মেয়েদের বাবা মায়েরা আমাকে প্রায়ই প্রশ্ন করে; কি ভাবে আমি আমার সমন্তানের ভবিষ্যৎ কমপিউটারে গড়ে তুলতে পারি। আমি উত্তর দিই, তাদের যতটুকু সম্ভব পড়ান। হাই-স্কুল ও কলেজের গন্ডি পার হতে দিন। তাদের শেখান কি করে শিখতে হয়? ক্যাথি কিডল্যান্ড, একজন স্কুল টিচার যিনি ওহিও স্টেটের একটি স্কুলে পড়ান। আমাকে অভিযোগ করে একটি চিঠি লিখেছেন। তুমি তোমার হাই স্কুল লাইফ শেষ করনি, কিন্তু দুনিয়ার সবচেয়ে বড়লোক বনে গেছ। তাই আমার ছাত্ররা আজকাল আর পড়াশুনা ঠিক মত করতে চায় না। তারা পালিয়ে বিল গেইটসতে চায়।

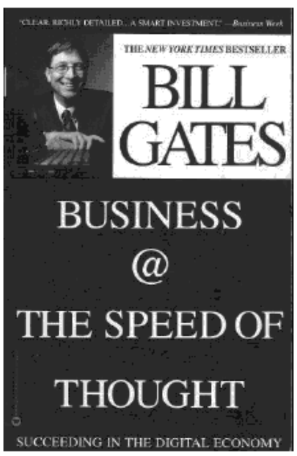

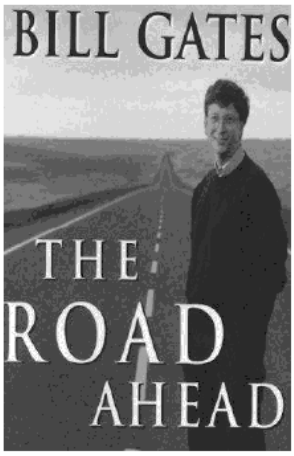

বিল গেইটস বিখ্যাত বইগুলোর প্রচ্ছদ

আমার উত্তর ছিল সহজ আর একেবারেই সরল, আমি তো হাই স্কুল পালাইনি। আমি তিন বছর হারভার্ডেও তো পড়েছিলাম এবং যখন পড়েছি তখন খুব ভাল করেই পড়েছি। তারপর একেবারে নিশ্চিত হয়েই পড়া ছেড়েছি। কিন্তু এমন কি কোন সফল্য দেখেছ তুমি? যে কমপিউটারের দুনিয়ায় খুব সাফল্য পেয়েছে কিন্তু মাত্র হাইস্কুল পাশ বা পালানো? আমি নিজেও শুনিনি। তাই তোমার ছাত্রদের ভাল করে পড়তে বল, আমার কাছে এমন অনেক ব্রিলিয়ান্ট কমপিউটারবিদ এসেছে যারা, ভাল কমপিউটার জানে কিন্তু মাত্র স্কুলে পড়ে বা স্কুলের পড়াও শেষ করেনি। আমি তাদের মাত্র একটি কথাই বলেছি এবং সেটি হল- *NO*। আরও জানতে চাও? অবশ্য স্কুল, কলেজ বা বিশববিদ্যালয়ই তোমাকে সব শিখিয়ে দেবে না। তোমাকে আরও জানতে হবে। লাইব্রেরী বা যে কেউ তোমাকে জানতে সাহায্য করতেই পারে। প্রচুর জান এবং শেখ। সেটাই তোমাকে সাহায্য করবে। আরেক অভিভাবক আমাকে বলছে, আমার ছেলে শুধু কমপিউটারে A+ পায় কিন্তু অন্য সব বিষয়ে তার মার্কিং প্রায় বলতে গেলে ফেল। আমি তাকে সতর্ক করে দিলাম। কারণ, এমনটি কখনই করা উচিত নয়। শুধু কমপিউটারের প্রতি ইন্টারেস্ট তার পৃথিবীকে ছোট করে দিচ্ছে। আরও অনেক কিছুই শেখার আছে। যা তার জীবনে অনেক কাজে লাগবে। কিন্তু সে নিজেকে বঞ্চিত করছে। এটা অনুচিত। হাই-স্কুল বা কলেজে ভাল করার মানে অবশ্য এই নয় যে তুমি পরবর্তী জীবনেও ভাল করবে কিন্তু তুমি যেখানে বিশাল ভ্যারাইটির সাবজেক্টকে জানার সুযোগটা পাচ্ছ; তা তুমি নেবে না কেন? কেন তুমি শুধু কমপিউটারে তোমার জীবন ও জানাটাকে ছোট করে ফেলবে। তাই শেষ কথা হলো। প্রচুর জানতে চেষ্টা করো। আর কোক-পিজার কথা ভুলে যেও না। তারা আমাকে অনেক সাহায্য করেছে- বিল গেইটস হতে।

বিল গেইটস বাংলাদেশের একটি রাসত্মায়

বিল গেইটস কিছুদিন আগে ২০০৬ সালে বাংলাদেশেও আসেন এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। বিশ্বের কর্মময় এই ব্যক্তিটির বেতন ১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

প্রোগ্রামিং সংকেতের শিল্পী- ডোনাল্ড নুথ (Donald Knuth)

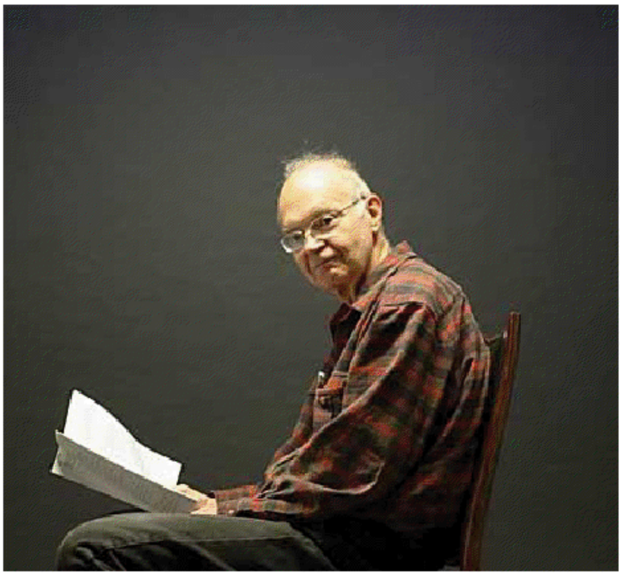

এই ছবিটি সঙ্গীত প্রিয় একজন কম্পিউটার বিজ্ঞানীর নাম তাঁর ডোনাল্ড নুথ। ডোনাল নুথ হলেন বিখ্যাত স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এবং একজন কম্পিউটার বিজ্ঞানী। দুনিয়ার মানুষ তাঁকে চেনে তাঁর বিখ্যাত পাঁচ খন্ড বইয়ের জন্য যার নাম হলো ''আর্ট অব কম্পিউটার প্রোগ্রামিং''। এর বাইরেও তিনি টেক্স (T_EX) টাইপ সেটিং সিস্টেমের জনক হিসেবে পরিচিত।

নুথ জন্মগ্রহণ করেন উত্তর আমেরিকার উইসকনসিনে। ১৯৬১ সালে তিনি কেইস ইনস্টিটিউট হতে ব্যাচেলর ও মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন এবং ১৯৬৩ সালে ক্যালিফর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনলজি হতে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর তিনি সেখানেই প্রফেসর হিসাবে যোগদান করেন এবং ''আর্ট অব প্রোগ্রামিং'' বই লেখার কাজ শুরু করেন। ১৯৬৮ সালে তিনি এর প্রথম খন্ড লেখেন এবং একই সাথে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ১৯৯২ সালে তিনি ফরাসী সায়েন্স একাডেমীর সদস্য হন কিন্তু একই বছরে তিনি স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্বেচ্ছায় অবসর নেন যাতে অবশিষ্ট খন্ডটি লেখার কাজ শেষ করতে পারেন তাঁর যুগসুচনাকারী গ্রন্থের, তিনি টুরিং পুরস্কার সহ অসংখ্য সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন তাঁর এই কাজের জন্য।

দৃষ্টিনন্দন কেইস ইনস্টিটিউট বর্তমানে কেইস রিজার্ভ বিশ্ববিদ্যালয়। এখানেই পড়তে আসেন নুথ এবং পদার্থ বিজ্ঞান পড়া বাদ দিয়ে গণিত পড়তে লাগলেন

পর্যায়ে জানি যে, টুরিং পুরস্কার (ইংরেজি ভাষায়: *Turing Award*) কম্পিউটার বিজ্ঞানে অবদানের জন্য প্রদান করা একটি সম্মাননা। অ্যাসোসিয়েশন ফর কম্পিউটিং মেশিনারি বা এসিএম প্রতি বছর এই পুরস্কারটি প্রদান করে থাকে। এটিকে কম্পিউটার বিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার বলা হয়ে থাকে। কম্পিউটার বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ অ্যালান টুরিং-এর নামানুসারে এই পুরস্কারটির নামকরণ করা হয়েছে।

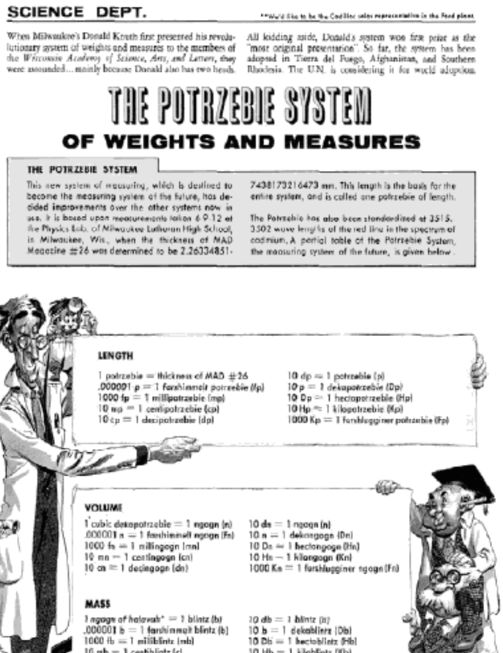

SCIENCE DEPT.

When Milwaukee's Donald Knuth first presented his revolutionary system of weights and measures to the members of the *Wisconsin Academy of Science, Arts, and Letters*, they were astounded... mainly because Donald also has two heads. All kidding aside, Donald's system won first prize as the "most original presentation". So far, the system has been adopted in Tierra del Fuego, Afghanistan, and Southern Rhodesia. The U.N. is considering it for world adoption.

THE POTRZEBIE SYSTEM

OF WEIGHTS AND MEASURES

THE POTRZEBIE SYSTEM

This new system of measuring, which is destined to become the measuring system of the future, has decided improvements over the other systems now in use. It is based upon measurements taken 6-9-12 at the Physics Lab. of Milwaukee Lutheran High School, in Milwaukee, Wis., when the thickness of MAD Magazine #26 was determined to be 2.26334851-7438173216473 mm. This length is the basis for the entire system, and is called one potrzebie of length.

The Potrzebie has also been standardized at 3515.3502 wave lengths of the red line in the spectrum of cadmium. A partial table of the Potrzebie System, the measuring system of the future, is given below.

LENGTH

1 potrzebie = thickness of MAD #26
.000001 p = 1 farshimmelt potrzebie (fp)
1000 fp = 1 millipotrzebie (mp)
10 mp = 1 centipotrzebie (cp)
10 cp = 1 decipotrzebie (dp)
10 dp = 1 potrzebie (p)
10 p = 1 dekapotrzebie (Dp)
10 Dp = 1 hectopotrzebie (Hp)
10 Hp = 1 kilopotrzebie (Kp)
1000 Kp = 1 furshlugginer potrzebie (Fp)

VOLUME

1 cubic dekapotrzebie = 1 ngogn (n)
.000001 n = 1 farshimmelt ngogn (fn)
1000 fn = 1 millingogn (mn)
10 mn = 1 centingogn (cn)
10 cn = 1 decingogn (dn)
10 dn = 1 ngogn (n)
10 n = 1 dekangogn (Dn)
10 Dn = 1 hectongogn (Hn)
10 Hn = 1 kilongogn (Kn)
1000 Kn = 1 furshlugginer ngogn (Fn)

MASS

1 ngogn of halavah* = 1 blintz (b)
.000001 b = 1 farshimmelt blintz (b)
1000 fb = 1 milliblintz (mb)
10 mb = 1 centiblintz (c)
10 cb = 1 deciblintz (db)
10 db = 1 blintz (b)
10 b = 1 dekablintz (Db)
10 Db = 1 hectoblintz (Hb)
10 Hb = 1 kiloblintz (Kb)
1000 Kb = 1 furshlugginer blintz (Fb)

*Halavah is a form of pie, and it has a specific gravity of 3.1416 and a specific heat of .31416.

PICTURES BY WALLACE WOOD

36

আমেরিকার বিখ্যাত রম্য পত্রিকা ম্যাড (*MAD*) এ নুথ তার আর্টিকেল ছাপিয়েছেন। এটি ছিল তার প্রথম বৈজ্ঞানিক লেখা, যা ছাপা হয় ১৯৫৭ সালে

স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তার আপন কক্ষে "আর্ট অব কপিউটার প্রোগ্রামিং" নিয়ে ব্যস্ত মহান এই কম্পিউটার প্রোগ্রামিং শিল্পী

২০০৩ সালে তিনি ব্রিটেনের ফেলো অব রয়্যাল সোসাইটি নির্বাচিত হন এবং সেই সাথে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে আমন্ত্রিত হন। শুধু কম্পিউটার নিয়ে লেখালেখি নয়, পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ বাইবেল নিয়েও তিনি লেখেন *3:16 Bibel Texts Illuminated* সেখানে তিনি প্রমাণ করেন পবিত্র বাইবেল গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে ১৬ তম পদের বৈশিষ্ট্য।

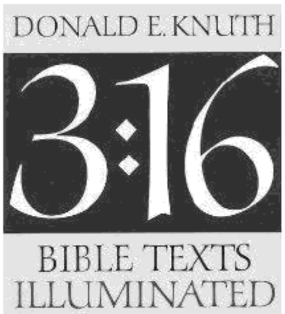

পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ বাইবেল নিয়েও তিনি লেখেন

তাঁকে নিয়ে নানান তথ্যও প্রচলিত যেমন কেউ যদি তাঁর বইয়ের ভুল বের করতে পারেন তবে তিনি ভ্রম সংশোধককে ২.৫৬ ডলারের একটি চেক নিজ হাতে সাইন করে দিয়ে থাকেন। মজার ব্যাপার হলো বাংলাদেশ থেকেও কেউ কেউ এই চেক পেয়েছেন।

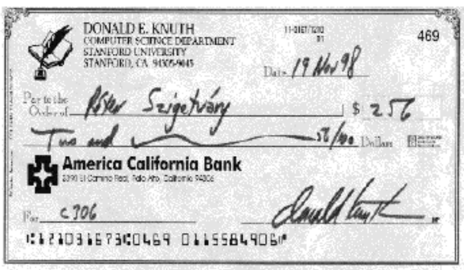

কেউ যদি তার বইয়ের ভুল বের করতে পারেন তবে তিনি ভ্রম সংশোধককে ২.৫৬ ডলারের একটি চেক নিজ হাতে সাইন করে দিয়ে থাকেন-

এই সেই চেক

ডোনাল্ড নুথ মার্কিন স্ট্যানফোর্ড বিশববিদ্যালয় এখন প্রফেসর এমেরিটাস। তাঁর বই দ্য আর্ট অফ কম্পিউটার প্রোগ্রামিং কম্পিউটার বিজ্ঞানের অসামান্য সৃষ্টি। নুথের সফটওয়্যার টেক্স এর ভার্সন শুরু হয়েছিল পাই (π) এর মান অনুযায়ী অর্থাৎ ৩.১, ৩.১৪, ৩.১৪১, ৩.১৪১৬ ইত্যাদি।

$\LaTeX$

লাটেক্স *(LAT$_E$X)* - কম্পিউটারে লেখালেখির এই সফটওয়্যারের ভিত্তিটিও কিন্তু নুথের তৈরী টেক্স (T$_E$X) হতে

পাইপ অর্গান বাজাতে ভালবাসলেও তিনি এই যন্ত্রের উপর কোন দক্ষতা দাবী করেন না মহান এই প্রোগ্রামিং সংকেতের শিল্পী নুথ

আরও মজার ব্যাপার হলো তিনি এখন আর ই-মেইলে ব্যবহার করেন না। এর পেছনে তার যুক্তি হলো এক জীবনের জন্য তিনি যথেষ্ট পরিমান ই-মেল ব্যবহার করে ফেলেছেন, তিনি শুধু ডাক যোগে মানুষের সাথে যোগাযোগ রাখেন। তিনি গীর্জায় পাইপ অর্গান বাজাতে ভালবাসলেও তিনি এই যন্ত্রের উপর কোন দক্ষতা দাবী করেন না।

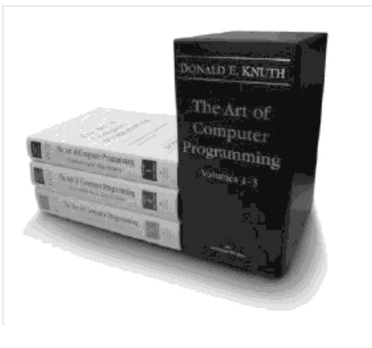

"আর্ট অব কম্পিউটার প্রোগ্রামিং" বই নুথের অসমান্য সৃষ্টি

নুথ বিয়ে করে জীল নুথকে এবং তার দুটি সন্তান রয়েছে। তিনি আমেরিকার জাতীয় বিজ্ঞান পুরষ্কার লাভ করেন ১৯৭৯ সালে।

সফটওয়্যার ইন্টারফেস এর সেরা শিল্পী- কাই ক্রুজ (Kai Krause)

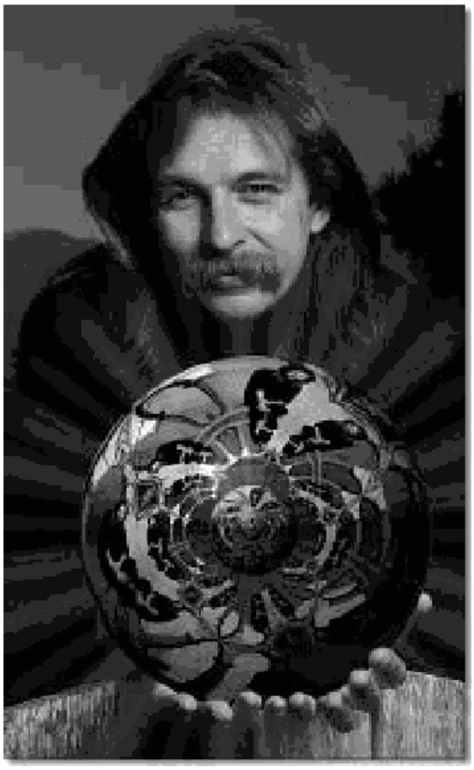

কাই ক্রুজের জন্ম জার্মান দেশের ডারমন্ডে ১৯৫৭ সালে। তিনি একজন সফটওয়্যার আর্টিষ্ট অর্থাৎ রংতুলি আর ক্যানভাসে ছবি না এঁকে তিনি আঁকেন সফটওয়্যারের ইন্টারফেসে। তাই তাঁর তৈরী সফটওয়্যারগুলো সবসময় অন্যদের চেয়ে আলাদা। দেখা যায় প্রচলিত সামন্তরিক আকৃতির ধুসর বাটনের বদলে তিনি তাঁর সফটওয়্যারের বাটনগুলো হয় সবুজ চুনি-পান্নার আকৃতি। যাতে চাপ দিলে নির্দিষ্ট কোন ফলাফল আসবে এমন কোন কথাও নেই। অসীম সংখ্যক কম্বিনেশনের মাধ্যমে প্রতিবারই ফলাফল আসে নতুন মাত্রায়। তিনি সর্বাধিক পরিচিতি পান মেটা ক্রিয়েশনস (*Meta Creations*) নামের সফটওয়্যার নির্মানকারী প্রতিষ্ঠানের জনক হিসেবে। অবশ্য এটি পূর্বে মেটাটুলস নামেই পরিচিত ছিল।

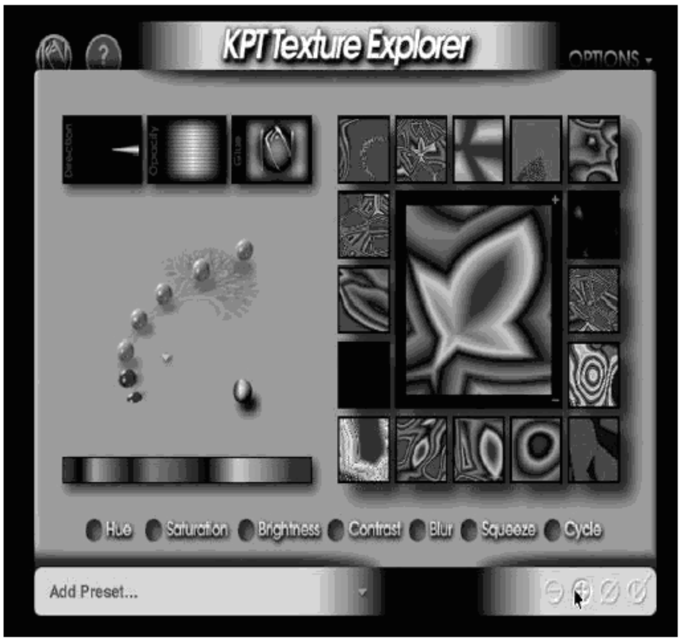

কাইয়ের তৈরী অসাধারণ একটি ইন্টারফেস। সেই ১৯৮০ দশকে কাই কিভাবে যে উদ্ভাবন করেছিলেন তা এখনও সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের বিস্ময়

কাইয়ের তৈরী অসাধারণ সব সফটওয়ারের মধ্যে রয়েছে- Kai's Power Tools (ফটোশপ ফিল্টারিং এর জন্য অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি সফটওয়্যার), Bryce (ত্রিমাত্রিক ভূমিচিত্র তৈরীর জন্য বিখ্যাত), Corel Painter, Poser, Live Picture, Raydream, Infini-D, Photo Show, Goo এবং Soap সফটওয়্যার।

ফোটোশপের একটি কাই ফিলটার

ছবির বারটা বাজানোর জন্য কাই পাওয়ার গু

ল্যান্ডস্কেপ তৈরীর জন্য- ব্রাইস থ্রিডি

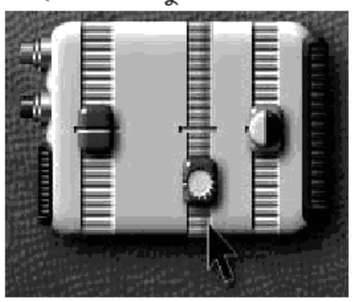

কাই এর রংতুলির বক্স

কাই এর পাওয়া ফোটা শো

কাইয়ের বাটনের আকৃতিই ভিন্ন

কাই ক্রুজের বিচিত্র ইন্টারফেস সমৃদ্ধ যত সফটওয়্যার

তাঁর সফটওয়্যারে ব্যবহৃত অসাধারণ সব ত্রিমাত্রিক ইউজার ইন্টারফেস যা পরবর্তীতে ব্যবহৃত হয় উইন্ডোজ, ম্যাকওস এক্স, লিনাক্স প্রভৃতি অপারেটিং সিস্টেমে ইন্টারফেসে। বিশেষ করে সফট শ্যাডো বাটনের রাউন্ডেড কর্ণার, ট্রান্সলুয়েন্সি এগুলো সেই ১৯৮০ দশকে কাই কিভাবে যে উদ্ভাবন করেছিলেন তা এখনও সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের বিস্ময়।

১৯৭৬ সালে কাই চলে আসেন জার্মানী হতে আমেরিকার ক্যালিফর্নিয়ায়। মজার ব্যাপার হলো সফটওয়্যার শিল্পে কাজ না করে তিনি কাজ শুরু করেন চলচিত্রে এবং তৎকালীন সেরা সাইন্সফিকশন সিনেমা স্টারট্রেকের সাউন্ড ইফেক্ট তৈরী করে তিনি জিতে নেন ক্লায়ো অ্যাওয়ার্ড। তিনি সান্টা বারবারার ব্রুকল ইন্সটিটিউট হতে মাস্টার্স ডিগ্রী এবং জার্মানীর ইসেন বিশ্ববিদ্যালয় হতে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

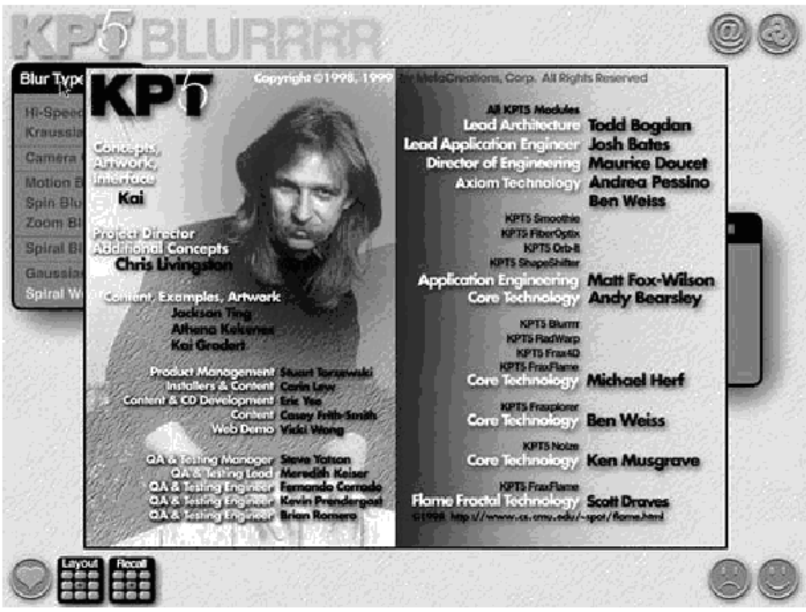

কাইয়ের তৈরী অসাধারণ একটি সফটওয়্যারের ভেতরে কাইয়ের ছবি। সাধারনতঃ কম্পিউটার গেইমে ডেভেলপারদের ছবি থাকলেও সফটওয়্যারের ইন্টারফেসে তা থাকে না

কাইয়ের একটি জনপ্রিয় উক্তি হলো- একটি ইন্টারফেস হবে এমন যা ব্যবহারকারীর কাছ থেকে যাবতীয় জটিলতাকে সরিয়ে প্রতি ক্লিকেই দিতে থাকবে অভিনব ফলাফল। অসংখ্য নামী এবং জনপ্রিয় সফটওয়্যার ও ইন্টারফেসের এই কারিগর সাম্প্রতি আবার ফিরে গেছেন তাঁর জন্মভূমি জার্মানীতে। সেখানে

প্রায় ১০০০ বছরের এক পুরাতন দূর্গ কিনে বানিয়েছেন অভিনব এক প্রযুক্তি ল্যাবরেটরী। দূর্গের নামটাও মজার Byte Burg.

১০০০ বছরের এক পুরাতন দূর্গ কিনে বানিয়েছেন অভিনব এক প্রযুক্তি ল্যাবরেটরী। দূর্গের নামটাও মজার- বাইটবার্গ। টাইম মেশিন নামের এক প্রযুক্তি নিয়ে গবেষনা করছেন তিনি এখন

জার্মানীর বাইটবার্গ দূর্গে লুকিয়ে আছেন কাই। অনেক ভক্ত আজও তাঁকে ও তাঁর সৃষ্টিশীলকাজে খুঁজে ফেরে

২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে তিনি সেরা ১৫ জন উদ্ভাবকের তালিকায় স্থান পেয়েছেন DEMO-Hall of fame এর দ্বারা। তার সব সফটওয়্যারের ব্যতিক্রমী ইন্টারফেস ইন্ডাষ্ট্রী মানের নয় বলে বোদ্ধারা বলে থাকলেও বিশ্বে কোনায় কোনায় তার অনেক ভক্ত আজও তাঁকে ও তাঁর সৃষ্টিশীলকাজে খুঁজে ফেরে।

সি ও সি-প্লাস প্লাস প্রোগ্রামিং ভাষার কারিগর- কেন থম্পসন, ডেনিস রিচি ও বিজার্নে স্ট্রাউস্ট্রাপ **(Ken Thompson, Dennis Ritchie, Bjarne Stroustrup)**

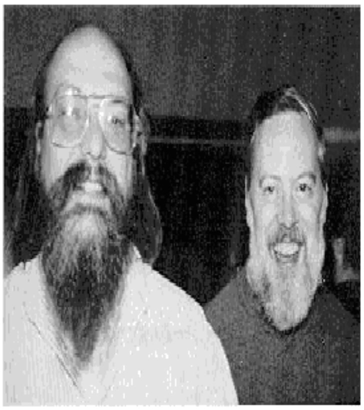

কেন থম্পসন, বিজার্নে স্ট্রাউস্ট্রাপ, ডেনিস রিচি (বাম দিক থেকে) - সি ও সি-প্লাস পলাস প্রোগ্রামিং ভাষার প্রধান কারিগর এরাই

যারা প্রোগ্রামিং করতে ভালবাসেন আর কম্পিউটার প্রোগ্রামিং নিয়ে কাজ করেন, তাঁরা সবাই প্রোগ্রামিং ভাষা হিসেবে সি ও সি-প্লাস প্লাস (C++) এর সাথে পরিচিত।

সি ভাষার কারিগর হিসেবে ব্যাপক পরিচিত একজন মানুষ হলেন ডেনিস রিচি। তাঁর জন্ম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছুদিন পূর্বে ১৯৪১ সালে। তিনি মূলত ALTRAN, B, BCPL, C, Multics এবং Unix অপারেটিং সিস্টেমের প্রধান সঞ্চালক। ১৯৮৩ সালে তিনি কম্পিউটার দুনিয়ার নোবেল হিসেবে পরিচিত টুরিং অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন এবং ১৯৯৮ সালে আমেরিকার জাতীয় পুরষ্কার লাভ করেন। বর্তমানে তিনি লুসেন্ট টেকনলজিতে কর্মরত আছেন সিস্টেম সফটওয়্যার গবেষণা বিভাগের প্রধান হিসেবে।

১৯৬৭ সালে রিচি বিশ্ববিখ্যাত হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয় হতে পদার্থ ও গণিতে পড়াশুনা শেষ করে যোগ দেন বেল ল্যাবরেটরির কম্পিউটার বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রে।

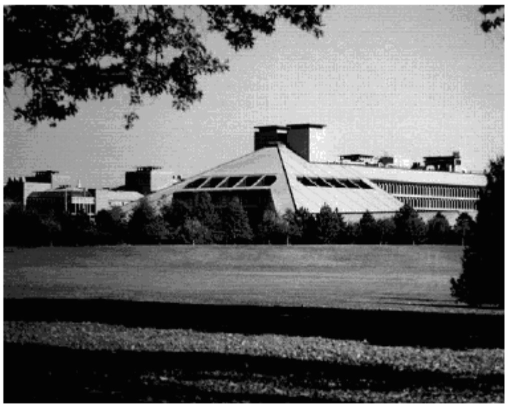

নিউজার্সির মুরারী হিলে বেল ল্যাবরেটরির কম্পিউটার বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রে কাজ করেন সি ভাষার সৃষ্টা ডেনিস রিচি

তিনি যখন পড়াশুনা করছিলেন হারর্ভাডের পদার্থ বিজ্ঞানে তখনই তিনি বুঝতে পারছিলেন যে, পদার্থ বিজ্ঞানী হবার তেমন কোন সম্ভাবনা তাঁর নেই এবং মাস্টার্স পড়ার সময় তিনি এটা আরও অনুভব করলেন। ফলশ্রুতিতে তিনি আগ্রহী হয়ে উঠলেন কম্পিউটারের প্রতি এবং বিশেষ করে প্রোগ্রামিং ভাষার দিকে। আর একই সাথে বাবার কথা শুনে তিনি যোগ দিলেন বেল ল্যাবরেটরীতে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো- তাঁর ভাষায় তিনি পদার্থ বিজ্ঞানীদের মত তেমন স্মার্ট মানুষ নন।

তখনকার সময় বেল ল্যাবে বসে তিনি তৈরী করলেন মালটিকস মেশিনের (এক ধরনের কম্পিউটার বটে!) জন্য BCPL কম্পাইলার। যাকে বলা হয় বেসিক কম্বাইনড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। একই সাথে তিনি কাজ করতে লাগলেন ALTRAN ভাষার কম্পাইলার তৈরীর জন্য।

ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেমও ডেনিস রিচির হাতের কাজ

তাঁর আরেকটি অন্যতম অবদান হলো কেন থম্পসনের সাথে ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেম বানানো। যদিও এটি বেল ল্যাবে তৈরী কিন্তু তখন থেকেই বিভিন্ন সরকারী এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তা দারুন জনপ্রিয়তা লাভ করলো। কেন থম্পসন এবং রিচি দুজনে মিলে এর একটি পোর্টেবল সংস্করণ তৈরী করলেন।

ডেনিস রিচি ও কেন থম্পসনের সি (*C*) প্রোগ্রামিং ভাষার বইটি আজও প্রধান রেফারেন্স বই হিসেবে প্রোগ্রামিং এ বহুল ব্যবহৃত হয়

১৯৯৯ সালে ডেনিস রিচি ও কেন থম্পসনের হাতে তুলে দিচ্ছেন
ন্যাশনাল মেডাল অব টেকনোলজি আমেরিবার তৎকালীন বিল ক্লিনটন

কাজে ব্যসত্ম কেন থম্পসনের সাথে ডেনিস রিচি

অন্যদিকে থম্পসন আবার একটি প্রোগ্রামিং ভাষা নিয়ে কাজ করছিলেন যার নাম ছিল বি (B) প্রোগ্রামিং ভাষা। এতে বেশ কিছু সংযোজন এবং সংশোধন করে ডেনিস রিচি তৈরী করলেন সি (C) প্রোগ্রামিং ভাষা। এটি হয়ে উঠল অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি প্রয়োজনীয় এবং শিক্ষামূলক প্রোগ্রামিং ভাষা।

ছোট খাট কম্পিউটার হতে শুরু করে সুপার কম্পিউটারে পর্যন্ত এটি ব্যবহার হতে লাগলো। আমেরিকার ন্যাশনাল স্টান্ডার্ড ইন্সটিটিউট এর মান নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে এলো। ভাষাটি তৈরির প্রথম উদ্দেশ্য ছিল ইউনিক্স-এর কোড লেখায় এর ব্যবহার, কিন্তু অচিরেই এটি একটি বহুল ব্যবহৃত ভাষায় পরিণত হয়। পরবর্তী বিজ্ঞানী স্টুয়ার্সট্রাপের সি- প্লাস প্লাস (C++) ভাষার ভিত্তি হিসেবে এটি কাজে লাগলো।

আজকের দিনে তিনি লুসেন্টে টেকনলজিতে ছোট একটি গবেষণা গ্রুপের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তিনি প্রধানতঃ ডিস্ট্রিবিউটেড অপারেটিং সিস্টেম, ভাষা রাফটিং ও সুইচিং যন্ত্রাংশের উদ্ভাবনের কাজ করেন। ইনফেরনো অপারেটিং সিস্টেমের তৈরীর কাজও করেছেন।

প্রচন্ড উদ্ভাবনী ক্ষমতার অধিকারী এই কম্পিউটার বিজ্ঞানী জীবনে পেয়েছেন অনেক পুরষ্কার ও পরিচিতি। এর মধ্যে এসিএম তাঁকে সেরা গবেষনাপত্র লেখার জন্য দিয়েছে পুরষ্কার ১৯৭৪ সালে। এছাড়া টুরিং পুরষ্কার ও জাতীয় পুরষ্কারতো আছেই।

এবার আসি কেন থম্পসনের গল্পে। এই মহান কম্পিউটার বিজ্ঞানী মূলতঃ বি (B) প্রোগ্রামিং ভাষার জনক এবং ইউনিক্স ও প্লাস নাইন অপারেটিং সিস্টেমের কাজে সহায়তাকারী হিসেবেই পরিচিত।

কেনের জন্ম আমেরিকার নিউ অরলিন্সে ১৯৪৩ সালে। তিনি ডিগ্রী লাভ করেন আমেরিকার বিখ্যাত ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া (বার্কলে) হতে। তার মাস্টার্স থিসিস সুপারভাইজ করেন প্রফেসর বার্কল্যাম্প যিনি আবার বার্কল্যাম্প-মেসি অ্যালগোরিদমের জনক।

কেন থম্পসন দাবা খেলায় মত্ত

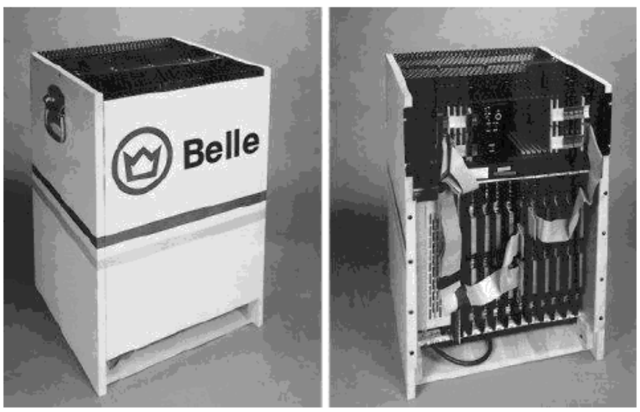

জোসেফ কোনস নামের আরেক বিজ্ঞানীর সাথে মিলে তিনি তৈরী করেন বেলে (*Belle*) নামের এক দাবা খেলার কম্পিউটার

যাই হোক প্রতিভাবান এই বিজ্ঞানী মূলতঃ থিওরী নিয়ে কাজ করলেও রেগুলার এক্সপ্রেশন ভিত্তিক টেক্সট সার্চিং ফিচার সমৃদ্ধ লেখালেখির সফটওয়্যার তৈরী করেন। জোসেফ কোনস নামের আরেক বিজ্ঞানীর সাথে মিলে তিনি তৈরী করেন বেলে (Belle) নামের এক দাবা খেলার কম্পিউটার।

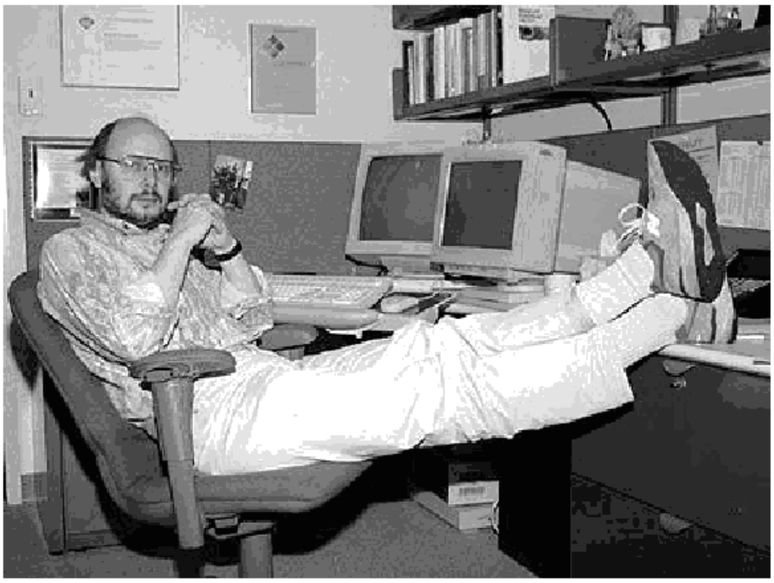

সি প্লাস প্লাস ভাষার জনক - বিজার্নে স্ট্রাউসট্রাপব টেক্সাস এএন্ডএম বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের কক্ষ

বিজার্নে স্ট্রাউসট্রাপ মূলতঃ কাজ করেন শিক্ষক হিসেবে টেক্সাস এ এন্ড এম বিশ্ববিদ্যালয়ে। অত্যন্ত প্রতিভাবান এই কম্পিউটারবিদ তৈরী করেন অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ভাষা সি প্লাস প্লাস। সারা বিশ্বে বহুল ব্যবহৃত এই প্রোগ্রামিং ভাষাটি অত্যন্ত জনপ্রিয় মেধাবী প্রোগ্রামারদের কাছে, বিশেষত এর অনবদ্য মডুলার প্রোগ্রামিং ফিচার থাকার কারণে।

তিনি এই প্রোগ্রামিং ভাষার অরিজিনাল ডিজাইনার ও ''দি সি প্লাস প্লাস'' প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ নামের বিখ্যাত বইয়ের রচয়িতা।

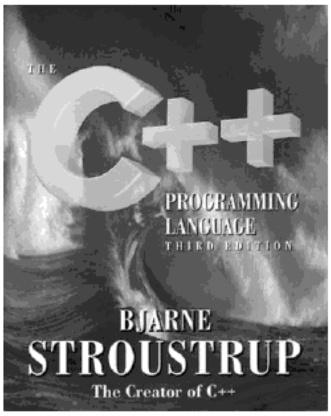

সি প্লাস প্লাস ভাষার জনক - বিজার্নে স্ট্রাউসট্রাপ এর বিখ্যাত বইয়ের কভার

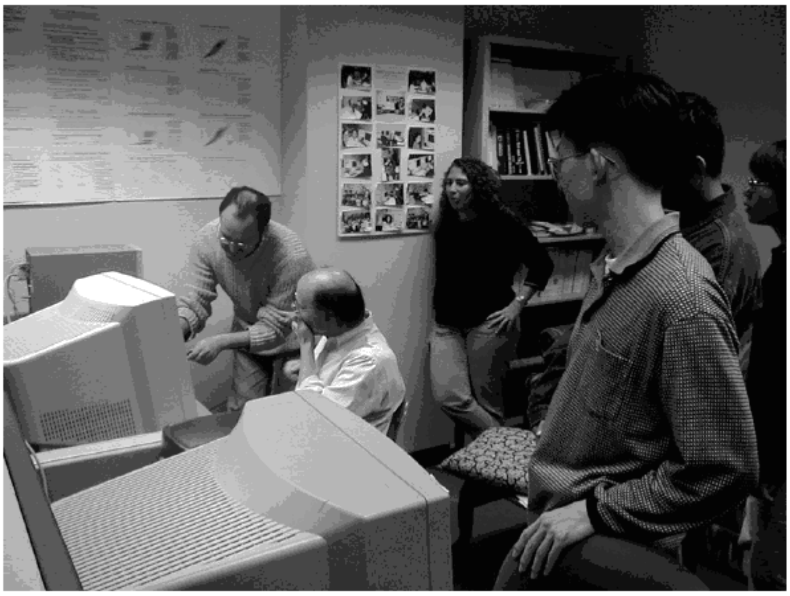

টেক্সাস এ এন্ড এম বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবে ছাত্রদের সাথে বিজার্নে স্ট্রাউসট্রাপ

টেক্সাস এএন্ডএম বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর এই বিজ্ঞানী তার পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৯ সালে। তার আগে পড়াশুনা করেন ডেনমার্কে আরহুস বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত ও কম্পিউটার বিজ্ঞান নিয়ে। ডেনমার্কেই জন্ম তাঁর।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হলেও টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ সংস্থা AT&T বেল ল্যাবরেটরীর তাঁর যোগাযোগ সবসময়ই ছিল। তাঁকে বলা হয় AT&T ফেলো। ২০০৪ সালে IEEE কম্পিউটার সোসাইটি শ্রেষ্ঠ কম্পিউটার উদ্যোক্তার পুরষ্কার দেয় তাঁকে। একই সাথে তিনি ACM ফেলো হিসেবেও কাজ করছেন ১৯৯৩ সাল থেকে।

তাঁর তৈরী করা প্রোগ্রামিং ভাষা সি প্লাস প্লাস পরবর্তী জাভা ও সি-শার্প ভাষা তৈরীতে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে। তাঁর লেখা বইটি ১৯টি ভাষার অনুদিত হয়েছে। সর্বমোট তিনি ৫টি বই লেখেন সবই প্রোগ্রামিং নিয়ে।

২০০৪ সালে আমেরিকার জাতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাকাডেমীর সি প্লাসপ্লাস ভাষা তৈরীর কারণে নিজেদের মেম্বার করে নেয়। অন্যদিকে ২০০৫ সালে সিগমা জাই *(Sigma Xi)* নামক গবেষনা গ্রুপ হতে তিনি পুরষ্কার লাভ করেন।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিস্ট্রিবিউটেড সিস্টেম কম্পিউটার ল্যাব হতে পিএইডি লাভ করেন বিজার্নে স্ট্রাউসট্রাপ।

ডেনমার্কের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর আরহুসে জন্ম নেয়া এই বিজ্ঞানী যখন আরহুস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার বিজ্ঞানে মাস্টার্স লাভ করেন তখন খুব বেশী মানুষ এই ডিগ্রী পেত না। পরবর্তীতে কেমব্রিজ ডিস্ট্রিবিউটেড সিস্টেম কম্পিউটার ল্যাব হতে পিএইচডি লাভ করেন। তিনি চার্চিল কলেজের মেম্বার ছিলেন। সেখানে তিনি তাঁর স্ত্রী ম্যারিয়েন চমৎকার সময় কাটান বহুদিন। সেখানেই জন্ম নেয় তাঁদের একমাত্র কন্যা আন্না মেরি। তাঁর মতে, কেমব্রিজ হলো বিশ্বের এক জাদুকরী শহর।

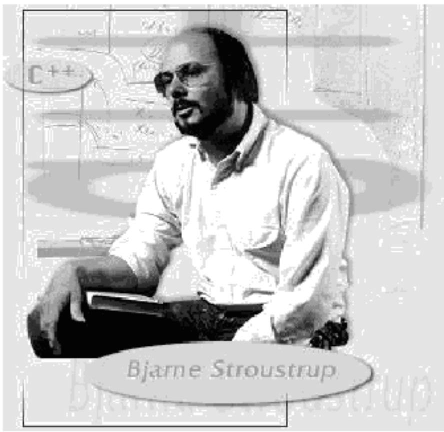

১৯৭৯ সালে বির্জানে তাঁর স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে চলে আসেন আমেরিকার নিউজার্সিতে বেল ল্যাবের রিসার্চ সেন্টারে যোগ দেওয়ার জন্য। সেখানে তিনি বাস করতে শুরু করে মেয়ের্সভিল নামের এক আবাসিক এলাকায়। তাঁর ছেলে নিকলাসের জন্ম হয় তখন, পরবর্তীতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেও বেল ল্যাবের সাথে যোগাযোগ রাখেন এবং তৈরী করতে থাকেন অসাধারণ সব কম্পিউটার সফটওয়্যার।

আমেরিকার বিভিন্ন ম্যাগাজিনগুলো তাকে বিভিন্ন সময়ে সম্মান জানিয়েছেন। ১৯৯৯ সালে ফরচুন ম্যাগাজিন আমেরিকার সেরা ১২ জন নবীন বিজ্ঞানীর একজন বলে আখ্যায়িত করেন। ১৯৯৫ সালে BYTE ম্যাগাজিন সেরা ২০ কম্পিউটার উদ্যোক্তার একজন উপাধিত করে।

আরও মজার হল, আমেরিকাতে কম্পিউটার জাদুঘর তাঁকে কম্পিউটার হল অব ফেম এ রাখে।

ফাজি (Fuzzy) লজিকের প্রবর্তক- লুতফি আসকর জাদেহ (Lotfi Asker Zadeh)

ইরানী এই মুসলিম কম্পিউটার বৈজ্ঞানিকের হাত ধরে উঠে এসেছে গণিতের নতুন এক শাখা- যার নাম ফাজি (Fuzzy) লজিক। ১৯৬৫ সালে একটি সেমিনারে প্রথম তিনি ফাজি সেট এর উপর গবেষনাপত্র লিখেন। পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালে ফাজি লজিকের প্রস্তাব করেন।

মূলত ফাজি (Fuzzy) লজিক হলো কম্পিউটার বিজ্ঞান ও গণিতের মিশ্রেন তৈরী তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের এমন এক শাখা যেখানে ধরা হয় শূণ্য (০) ও এক (১) অর্থাৎ Real numer [0,1] এর মধ্যেও সিদ্ধান্ত হতে পারে। এই বিজ্ঞানী প্রচলিত ক্যালকুলাসের জন্য নতুন কিছু অপারেশনও উদ্ভব করেন। অ্যারিস্টেটল উদ্ভাবিত রিট্রাকশন ও রিলাক্সেশন লজিকের ভিত্তিতে তার এই আবিস্কার। এটি ছাড়াও *Z-transformation* আবিস্কারের জন্য তাকে সম্মাননা দেওয়া হয়। ডিসক্রিট টাইম সিগনাল প্রসেসিং এর জন্য তাঁর উদ্ভাবিত *Z-transformation* মেথড ব্যবহৃত হয়।

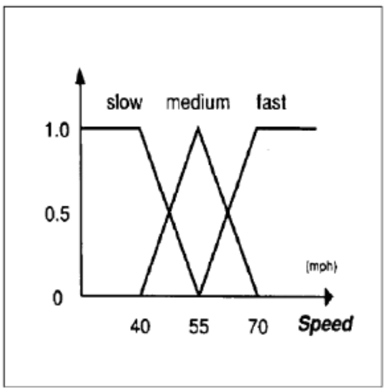

ফাজি (*Fuzzy*) লজিক হলো কম্পিউটার বিজ্ঞান ও গণিতের মিশ্রে তৈরী তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের এমন এক শাখা যেখানে ধরা হয় শূণ্য (০) ও এক (১) অর্থাৎ *Real numer [0,1]* এর মধ্যেও সিদ্ধান্ত হতে পারে

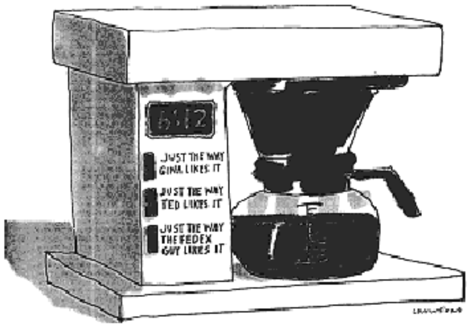

ফাজি (*Fuzzy*) লজিক ব্যবহারকরে তৈরী অনেক হয়
দৈনন্দিন ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি। যেমন- কফি মেশিন, রাইস কুকার ইত্যাদি

কাসপিয়ান সাগরের তীরে আজারবাইজানের বাকুতে জন্ম
এই মুসলিম কম্পিউটার বৈজ্ঞানিকের

মেধাবী এই বিজ্ঞানী আজারবাইজানের বাকু শহরে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর মা ছিলেন একজন রাশিয়ান ডাক্তার ও বাবা ছিলেন ইরানী সাংবাদিক। যিনি পেশার কাজে রাশিয়ায় অবস্থান করছিলেন। কিন্তু স্ট্যালিনের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কারণে তারা চলে আসেন ইরানে। সেখানে তিনি আল বর্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে পাঠ নেন। স্কুলের পাট শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মিলিত ভর্তি পরীক্ষায় তিনি অসাধারণ মেধার স্বাক্ষর রেখে ২য় স্থান দখল করে নেন এবং তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় হতে সফলভাবে তড়িৎ কৌশলে স্নাতক ডিগ্রী নেন।

এমআইটি (*MIT*) হতে মাস্টার্স ও পিএইচডি ডিগ্রী নেন লুতফি

পরবর্তীতে ১৯৪৪ সালে তিনি আমেরিকায় চলে আসেন এবং এমআইটি (MIT) হতে মাস্টার্স ও পিএইচডি ডিগ্রী নেন। এরপর তিনি ১৯৫৯ সাল থেকে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফর্নিয়া (বার্কলে) তে পড়ানো শুরু করেন। এরই সাথে তিনি ফাজি (Fuzzy) লজিকের ধারনার প্রবর্তন করেন।

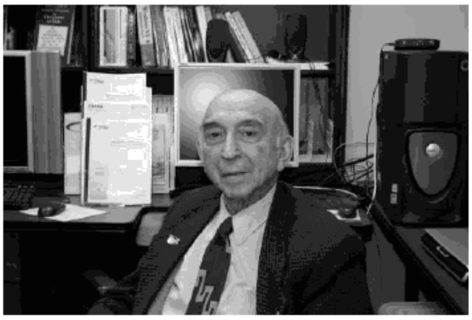

১৯৫৯ সাল থেকে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফর্নিয়া (বার্কলে) তে পড়ানো শুরু করেন। এরই সাথে তিনি ফাজি (*Fuzzy*) লজিকের ধারনার প্রবর্তন করেন

১৯৯৪ তে ACM তাকে ফেলো হিসাবে সম্মাননা দেয় এবং ১৯৯৫ তে IEEE হতে সম্মাননার মেডেল দিযে বলে, এই সম্মান তাকে দেওয়া হলো ফাজি লজিক এর ডেভেলপমেন্ট এবং এর বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন তৈরীর জন্য। এছাড়াও তিনি অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন এবং প্রকাশ করেন অনেক বই ও গবেষণাপত্র।

IEEE হতে সম্মাননার মেডেল পেলেন ফাজি লজিক এর ডেভেলপমেন্ট এবং এর বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন তৈরীর জন্য

ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফর্নিয়া (বার্কলে) এর শিক্ষকদের ক্লাবে সামনে দাড়িয়ে লুতফি জাদেহ

পারিবারিক জীবনে তিনি বিয়ে করেন ফাই জাদেহকে। তার দুই ছেলেমেয়ে নরমান জাদেহ ও স্টেলা জাদেহ।

মজার ব্যাপার হলো তার ছেলে নরমান জাদেহও ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া (বার্কলে) হতে পড়াশুনা ও ডক্টরেট শেষ করে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করলেও এখন তা বাদ দিয়ে *Perfect10* নামের একটি পর্নো ম্যাগাজিনের প্রকাশকের দায়িত্ব নিয়েছেন। এর কারণে ৪৬ মিলিয়ন ডলার আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েও তিনি এই কাজের পাশাপাশি আবার পোকার খেলায়ও (এক রকমের জুয়া) মন দিয়েছেন। আসলে তার এক বান্ধবী বিশ্ববিখ্যাত পর্নো পত্রিকা *Playboy*-এ কসমেটিক সার্জারী না করার কারণে শরীর প্রদর্শনের সুযোগ না পাওয়ায় নরমান জাদেহ এই উদ্যোগ নেন। *Perfect10* পত্রিকার বৈশিষ্ট্য হলো এতে মডেল হওয়ার জন্য প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া শারীরিক সৌন্দর্যই যথেষ্ট।

উইমেন ইন কম্পিউটিং- অনিতা বর্গ (Anita Borg)

অনিতা বর্গ একজন আমেরিকান মেয়ে কম্পিউটার বৈজ্ঞানিক। আমেরিকার শিকাগোতে ১৯৪৯ সালে তাঁর জন্ম। অল্প কয়েকজন মেয়ে কম্পিউটার বিজ্ঞানীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তিনি ১২ বৎসর আমেরিকার বিখ্যাত ডিজিটাল ইকুইপমেন্ট কোম্পানীতে গবেষক হিসেবে কাজ করেন। তিনি তৈরী করেন দ্রুতগতির মেমোরী সিস্টেম।

এরই সাথে উইমেন ইন কম্পিউটিং নামে একটি কনফারেন্স এর প্রবর্তন করেন।

অনিতা বর্গ ১৯৯৭ সালে ইনস্টিটিউট অফ উইমেন এন্ড টেকনোলজি নামে একটি প্রতিষ্ঠানের সূচনা করেন। এর কাজ হচ্ছে মেয়েদেরকে কম্পিউটার বৈজ্ঞানিক হতে উৎসাহিত করা। এটি ১৫০ মিলিয়ন ফান্ডিং পায় জেরক্স ও সান ম্যাক্রো সিস্টেম হতে।

জীবনে তিনি অসংখ্য অ্যাওয়ার্ড ও সম্মাননা পেয়েছেন। ১৯৯৯ সালে বিল ক্লিনটন তাঁকে বিশেষ প্রেসিডেন্টসিয়াল সম্মাননা দেন। মূলতঃ মেয়েদেরকে প্রযুক্তির দিকে উৎসাহিত করার কারনেই এর জন্য তিনি নির্বাচিত হন।

গুগল কোম্পানীর অনিতা বর্গ স্কালারশিপ পাওয়া ছেলেমেয়ের দল

অস্ট্রেলিয়ার UNSW ইউনিভার্সিটি তার নামে বিশেষ পুরষ্কার ঘোষণা করেন। মেয়েদেরকে তথ্য প্রযুক্তি পড়তে উৎসাহিত করার জন্য এবং তথ্য প্রযুক্তিতে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য তৈরি করতে গুগল কোম্পানী অনিতা বর্গ স্কলারশীপ দিয়ে থাকে। গণিত ও বিজ্ঞানের প্রতি অনিতা বর্গের ছিল অসাধরণ ভালবাসা, এ জন্য তিনি তাঁর মাকে কৃতিত্ব দিয়ে বলেন, *মা আমায় বলেছিল গণিত একটি খুবই মজাদার বিষয়। তাই আমি ভেবেছিলাম হতেও পারে।* নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডক্টরেট করা মহান এ মেয়ে কম্পিউটার বিজ্ঞানী ২০০৩ সালে ব্রেন ক্যান্সারে মৃত্যুবরণ করেন।

আধুনিক কম্পিউটার বিজ্ঞানের জনক- এলান টুরিং (Alan Turing)

কম্পিউটার বিজ্ঞানের জনক যদি কাউকে বলা যায়, তবে তিনি হবেন এলান টুরিং। তিনি কম্পিউটারে এলগোরিদম এর পরিমাপ করার জন্য আবিষ্কার করেন টুরিং মেশিন। এছাড়া কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জন্য টুরিং টেস্ট তাঁর আরেকটি নামকরা আবিষ্কার। ম্যানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে বসে তিনি তৈরী করেন ম্যানচেষ্টার মার্ক ওয়ান নামক একটি কম্পিউটার। ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ক্রিপটোগ্রাফির উপর প্রচুর কাজ করেন। জীবনে কম্পিউটার বিজ্ঞানের জন্য অসংখ্য অবদান রাখা এ বৈজ্ঞানিকের নামে ACM ১৯৬৬ সাল হতে টুরিং অ্যাওয়ার্ড নামে একটি অত্যন্ত সম্মানজনক পুরষ্কার প্রদান করা হয়ে থাকে। যা কম্পিউটার বিজ্ঞানীদের জন্য নোবেল পুরষ্কার এর সমতুল্য বলে ধরা হয়। তাঁর নামে ম্যানচেষ্টার শহরে রয়েছে বিশেষ রাস্তা, ব্রিজ ও ভাস্কর্য।

এলান টুরিং এর নামে লন্ডনের কিংস কলেজের একটি কক্ষ রয়েছে এখনও

এলান টুরিং জন্মগ্রহণ করেন লন্ডন শহরে ১৯১২ সালে। তার বাবা ছিলেন ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের একজন সদস্য। ছোটবেলা থেকে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি আলবার্ট আইনস্টাইনের তত্ত্ব বুঝে ফেলেন। প্রচন্ড মেধা থাকার পরও পরিশ্রম করার অনিচ্ছা ও প্রথাগত বিজ্ঞান পড়তে না চাওয়ার কারণে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজে পড়ার সুযোগটি হাতছাড়া করেন এবং ভর্তি হন কম র‍্যাংকিংয়ের কিংস কলেজে। সেখানে থেকে তিনি পড়া গ্রাজুয়েশন শেষ করেন।

পরবর্তীতে আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি তার পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি তার পিএইচডি গবেষনা পত্রে টুরিং মেশিনের ধারনা দেন। ১৯৪৫-৪৭ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ডের ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরিতে অটোমেটিক কম্পিউটিং ইঞ্জিন তৈরীতে ব্যস্ত ছিলেন।

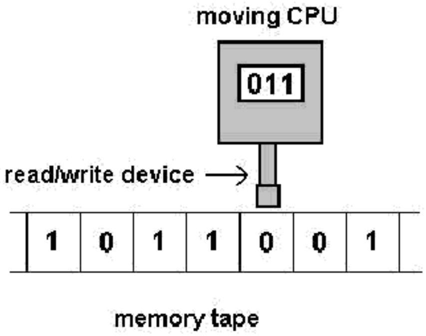

এলান টুরিং এর টুরিং মেশিনের ধারণা

১৯৪৬ সালে তিনি প্রথম স্টোর্ড প্রোগ্রাম কম্পিউটার এর ডিজাইন করেন। এরপর তিনি ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে যোগদান করেন এবং পরবর্তীতে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার ল্যাবরেটরির পরিচালক হন।

একটি কাল্পনিক টুরিং পরীক্ষা

তিনি সিমুলেটেড কম্পিউটারের ডিজাইন করেন এখানে বসে। এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জন্য টুরিং টেস্ট আবিস্কার করেন। এছাড়া গণিতের জন্য তিনি অবদান রাখেন।

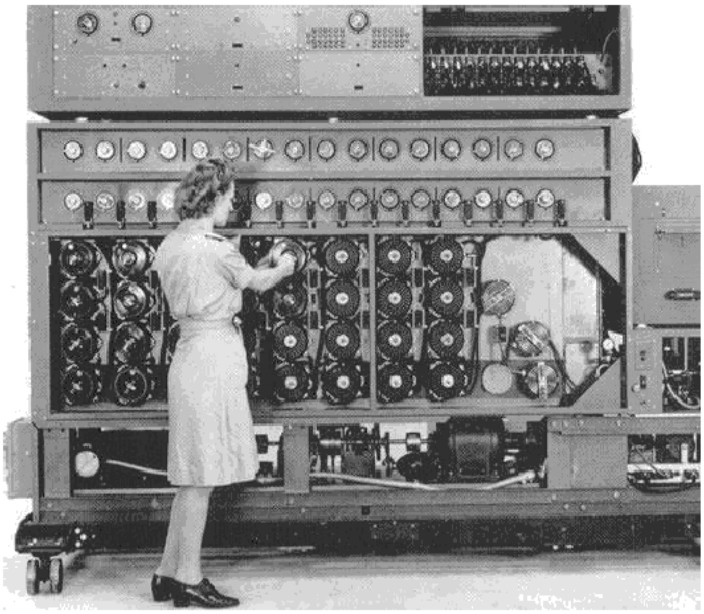

এলান টুরিং এর টুরিং মেশিনের ছবি

মেধাবী এই কম্পিউটার বিজ্ঞানীর মৃত্যু ঘটে ১৯৫৪ সালে রহস্যজনকভাবে। তিনি যে সময়ে জন্মেছিলেন হোমোসেক্সচুয়ালিটি নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু তিনি এর সাথে জড়িয়ে পরেন। ১৯৫৪ সালের ৮ই জুন সায়োনাইড বিষক্রিয়ায় মৃত অবস্থায় তাকে পাওয়া যায়।

যদিও বলা হয় তার মৃত্যুটি ছিল সুইসাইড কিন্তু অনেকে মনে করে তাকে মেরে ফেলা হয়েছিল। ২০০৬ সালে মেটমোস নামের ব্যান্ড সঙ্গীত দল এলান টুরিং এর জন্য বিশেষ গীতি রচনা করে। উল্লেখ্য এ ব্যান্ড দলটির দুই জন সদস্য স্বীকৃতভাবে হোমেসেক্সচুয়াল।

ইন্টেলের চেয়ারম্যান
ড. ক্রেইগ আর ব্যারেট (Craig Barrett)

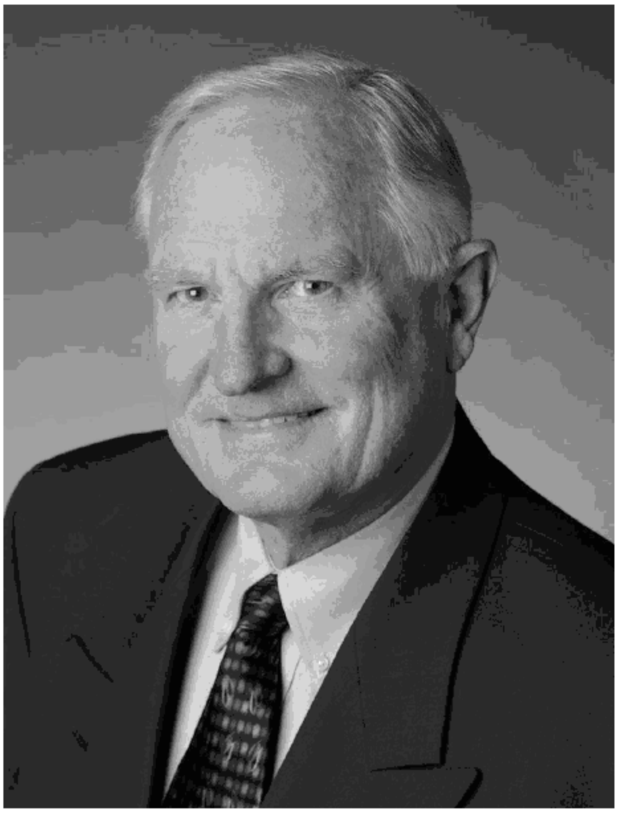

বিশেবর বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম ইন্টেল। এই প্রতিষ্ঠানের চতুর্থ প্রেসিডেন্ট এবং বর্তমান চেয়ারম্যান ড. ক্রেইগ আর ব্যারেট। তিনি যে কেবল ইন্টেলের চেয়ারম্যান তাই নয় তিনি যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা উন্নয়নের অন্যতম প্রধান সংগঠকও।

ক্রেইগ ব্যারেটের জন্ম ১৯৩৯ সালে সানফ্রানিসকোতে। তিনি স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি লাভ করেন বিখ্যাত স্ট্যানফোর্ড বিশববিদ্যালয় থেকে। স্নাতক সম্পন্ন করার পর তিনি যোগ দেন স্ট্যানফোর্ড বিশববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা ও প্রকৌশল বিভাগের প্রভাষক হিসেবে। তিনি এই বিভাগে যুক্ত ছিলেন ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত। সে সময় তিনি সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে শিক্ষকতা করছিলেন।

আকেরিকার সামন্মা ক্লারায় ইন্টেল করপোরেশনের হেড কোয়ার্টার

ব্যারেট ১৯৭২ সালে ডেনমার্কের ড্যানিশ কারিগরি বিশববিদ্যালয় থেকে ফুলব্রাইট ফেলো লাভ করেন। এর আগে ১৯৬৪-৬৫ সালে ইংল্যান্ডের ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবোরেটরি থেকে লাভ করেন এনএটিও পোষ্ট-ডক্টোরাল ফেলো। তিনি তার শিক্ষকতা জীবনে ম্যাটেরিয়াল প্রোপার্টিজের উপর মাইক্রোস্ট্রাকচারের প্রভাব নিয়ে প্রায় ৪০ টির মতন গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। ম্যাটেরিয়াল সাইন্সের উপর তাঁর লেখা বই বিভিন্ন বিশববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়। ১৯৭৪ সালে তিনি ইন্টেল কর্পোরেশনে টেকনোলজি ডেভোলপমেন্ট অফিসার হিসেবে যোগ দেন। ১৯৮৪ সালে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের ভাইস প্রেসিডেন্ট পদমর্যাদা লাভ করেন। ১৯৮৭ সালে সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ১৯৯০ সালে হন এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে পদন্নতি পান। ১৯৯২ সালে তিনি ইন্টেলের পরিচালক পর্ষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৯৩ সালে চিফ অপারেটিং অফিসার পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৯৭ সালে তিনি ইন্টেলের চতুর্থ প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনিত হন। ১৯৯৮ সালে প্রধান নির্বাহি কর্মকর্তা বা চিফ এক্সিকিউটিভ আফিসার পদ লাভ করেন। ২০০৫ সালের ১৮ই মে তিনি প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত হন।

বাংলাদেশে ইন্টেলের ক্রেইগ ব্যারেট

ড. ব্যারেট ইন্টেল ছাড়াও বিশেবর শীর্ষস্থানীয় কিছু সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত আছেন। জাতিসংঘের গ্লোবাল এলায়েন ফর ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি অ্যান্ড ডেভেলাপমেন্টের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। ট্রেড পলিসি এন্ড নেগোশিয়েশনের প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা কমিটি এবং আমেরিকান হেলথ ইনফরমেশন কমিউনিটির অন্যতম সদস্য ড. ব্যারেট। এছাড়াও তিনি বিজনেস কোয়ালিশন ফর স্টুডেন্ট এচিভমেন্ট এবং ন্যাশনাল ইনোভেশন ইনিশিয়েটিভ লিডারশিপ কাউনিলের যুগ-চেয়ারম্যান এবং ইউএস কাউনিল ফর ইন্টারন্যাশনাল কাউনিল এর ট্রাষ্টি বোর্ডের একজন মেম্বার। এখানেই শেষ নয়, 'ইনোভেশন আমেরিকা' নামের ন্যাশনাল গভার্নরস এসোসিয়েশন টাস্ক ফোর্স, ন্যাশেনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যাডভাইজরি কাউন্সিল এবং সাইন্টিফিক কমিউনিকেশন এন্ড ন্যাশনাল সিকিউরিটি কমিটির একজন সদস্য এবং ইউএস সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাষ্ট্রি এসোসিয়েশন, দি ন্যাশনাল ফরেষ্ট ফাউন্ডেশন, আর্কাইভ এবং টেকনেকের বোর্ড অফ ডিরেক্টরের একজন সদস্য।

শিক্ষাবিদ এবং স্ট্যানফোর্ড বিশববিদ্যালয়ের উপদেষ্টা হবার কারনে ড. ব্যারেট সবসময় চেষ্টা করেছেন ছাত্রদের জন্য নতুন কিছু করতে। এজন্য তিনি স্কুলগুলোর মান উন্নত করা এবং বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য উচ্চশিক্ষা ও প্রযুক্তি শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করতে চেষ্টা করে গেছেন সর্বদা। মার্কিন প্রেসিডেন্টকে তিনি সব সময় পরামর্শ দিয়েছেন শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে। বিভিন্ন স্কুলগুলোর মান বাড়ানোর বিষয়ে ওকালতিতে তাঁর জুড়ি নেই। তাঁর ব্যাক্তিগত উদ্যেগে ২০০০ সালে বোষ্টনে চালু হয় কম্পিউটার ক্লাব-হাউস নেটওয়ার্ক। এই কলাবের লক্ষ্য সমাজে প্রযুক্তিগত মতপার্থক্য কমিয়ে আনা। এছাড়া শিক্ষার মান উন্নয়নে তার নেয়া অন্য উদ্যেগগুলোর মধ্যে আছে -ইন্টেল সাইন ট্যালেন্ট সার্চ অ্যাওয়ার্ড স্কলারশিপ। যার অন্য নাম 'জুনিয়র নোবেল প্রাইজ', ২০০১ সালে চারটি স্থানে ইন্টেলের অলাভজনক ক্লাবহাউস তৈরি করেন, শিক্ষায় অবদানের জন্য ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স অফ বিজনেস অনার্স ঘোষণা করেন, ২০০১ সালে ইন্টেলের সকল 'কে-১২' শিক্ষকের জন্য টিচার ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রামের প্রসার বাড়ান। ক্রেইগ ব্যারেট ছিলেন আমেরিকান সেমিকন্ডাক্টর শিল্প সমিতির চেয়ারম্যান। তিনি এই শিল্পের উন্নয়নের রোডম্যাপ তৈরি করেন এবং বিভিন্ন বিশববিদ্যালয়ে গবেষণার ব্যবস্থা করেন। ড. ব্যারেট বিশবাস করেন যে কম্পিউটার যাদু করতে পারে না, তবে শিক্ষকরা পারেন। সেই বিশবাস থেকেই তিনি একটি প্রকল্প হাতে নেন যেই প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় ২৫ টি দেশের কমপক্ষে দশ লক্ষ শিক্ষককে প্রশিক্ষন দেওয়া হবে যেন তারা শ্রেনীকক্ষে প্রযুক্তি ব্যাবহার করার মাধ্যমে শিক্ষার মান বাড়াতে পারেন। বাংলাদেশের মাটিতেও পা রাখেন ক্রেইগ কিছুদিন আগে তার কর্মকান্ডের পরিচিতি নিয়ে। [2]

'হটমেইল' এর পেছনের মানুষটি- সাবির ভাটিয়া (Sabeer Bhatia)

Lance Iversen / The Chronicle

এবার বলি এক ভারতীয় কম্পিউটারবিদের গল্প। যিনি আজকের হট কেক ই-মেইল পোর্টাল 'হটমেইল' এর জনক, জন্ম তাঁর ভারতের ব্যাঙ্গালোরে। মা-বাবার আশা পূরণ করতে ১৯৮৮ সালে স্কলারশিপ নিয়ে পড়তে গেলেন আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া ইনটিটিউট অফ টেকনোলজিতে। ১৯ বছরের ভাটিয়া যখন সেই বছরের ২৩ সেপ্টেম্বর লসএঞ্জেলস এয়ারপোর্টে পা রাখলেন তখন তাঁর পকেটে ছিল মাত্র ২৫০ ডলার। পুরো আমেরিকায়ই ছিল তার অপরিচিত জায়গা। এমন কেউ নেই যে তাঁকে সাহায্য করতে পারে।

ক্যালিফোর্নিয়ার ক্যালটেক ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করে হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ভাটিয়া যোগ দিলেন স্টিভ জবসের অ্যাপল এ। সেখানকার অফিসের ই-মেইল ব্যবস্থা ভাটিয়াকে হতাশ করে। কারণ ই-মেইল করা গেলেও এতে কোনো প্রাইভেসি থাকতো না। কিভাবে এটিকে বিনামূল্যে এবং ব্যক্তিগত ব্যবহার উপযোগী করা যায় সেটি নিয়েই ভাবনাচিন্তা শুরু করেন ভাটিয়া আর তাঁর কলিগ জ্যাক স্মিথ। তাঁদের মিলিত ভাবনাই ইন্টারনেটে এক বিপ্লব ঘটায়, যার নাম হটমেইল।

১৯৯৬ এর কথা, তারা দেখলেন জাভাসফটের মাধ্যমে যে কোনো ব্যক্তি ইন্টারনেটে তার ব্যক্তিগত ডাটাবেজ তৈরি করতে পারে। যেখানে তারা তাদের ব্যক্তিগত তথ্যাদি, ছবি ইত্যাদি রাখতে পারে এবং যে কোনো স্থানের যে কোনো কম্পিউটার থেকে সেগুলো আবার দেখতে পারে। এ নিয়েই ভাটিয়া প্রথমে কাজ শুরু করেন। এ অবস্থায় তাঁর বন্ধু স্মিথ তাকে প্রস্তাব দেয় এ জাভাসফটের সঙ্গে ই-মেইল যোগ করার। ফলে এটিই সর্বপ্রথম ওয়েব পেজ ভিত্তিক ই-মেইল যেটি পৃথিবীর যে কোনো স্থান থেকে চেক করা যাবে।

তাঁদের স্বপ্নকে বাসত্মবায়িত করতে ভাটিয়া এবং স্মিথ দুজনই অ্যাপল কোম্পানির চাকরি ছেড়ে দিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার ফ্রিমোন্ট অঞ্চলে একটি ছোট অফিস গড়ে তুলেন। সেখানে ১৫ জনকে চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়।

সে বছরে জুনের মাঝামাঝি এসে তাদের অর্থাভাব দেখা দেয়। ফলে টাকার জন্য তারা ব্যাংক থেকে ধার নেন ১,০০,০০০ ইউএস ডলার।

হটমেইল কোম্পানীর লোগো

৪ জুলাই ১৯৯৬ সালে আমেরিকার বিজয় দিবসে ভাটিয়া এবং স্মিথ তাঁদের নতুন কোম্পানির উদ্বোধন ঘোষণা করেন। যার নাম ছিল হটমেইল। তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন যে তাঁদের ফ্রি ই-মেইল টুলটি কম সময়েই ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করবে। তাঁদের কোম্পানির উদ্বোধনের দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য আমেরিকার বিজয় দিবসকে বেছে নেন তারা।

ওই সময়ে যাদেরই কম্পিউটার ছিল তাদেরই একটি করে ই-মেইল অ্যাকাউন্ট ছিল। কিন্তু এ হটমেইলের ফলে যার কম্পিউটার নেই সেও একটি ই-মেইল অ্যাকাউন্টের মালিক হতে পারল এবং যে কোনো স্থান থেকে তার মেইল চেক করতে পারতো।

সফল ইন্টারনেট উদ্যোক্তা সাবির ভাটিয়া

হটমেইলের প্রথম সদস্য ভাটিয়া নিজে। তিনি এবং স্মিথ উদ্বোধনের পরপরই তাদের বন্ধুদের মেইল করেন। এভাবে প্রথম দেখা যায় হটমেইলের সদস্য সংখ্যা ১০০-তে এসে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয়তে সেটি গিয়ে দাঁড়ায় ২০০। তৃতীয় বারে ২৫০। ওই সময়ে যারা হটমেইলের সদস্য হয়েছিলেন তাদের মধ্যে শতকরা ৮০ জনই জানান, তারা হটমেইলের সন্ধান পেয়েছেন বন্ধুদের কাছ থেকে। এ ফ্রি মেইল বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য নতুন উৎসবের সৃষ্টি করে। যার ফলে হটমেইল কোম্পানির আয়ও বাড়তে থাকে দ্রুততগতিতে। হটমেইল ধীরে ধীরে তার সদস্যদের বিভিন্ন রকমের সংবাদ এবং অন্যান্য ইন্টারনেট সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তি পাঠাতে থাকে। এভাবে

বিভিন্ন কোম্পানি তাদের খবরাখবর পাঠানোর জন্য হটমেইল কোম্পানির দ্বারস্থ হয়। ফলে হটমেইল কোম্পানি খুব দ্রুততই ব্যবসায়িকভাবে সফল হতে শুরু করে। হটমেইলের এ দ্রুত প্রচার ও প্রসার ভাটিয়াকে উদ্বিগ্ন করে তোলে এটির নিরাপত্তার ব্যাপারে। কারণ ওই সময় পর্যমত্ম তাদের কর্মী ছিল মাত্র ২৫ জন, যা হটমেইলকে হ্যাকিং এর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য পর্যাপ্ত ছিল না। এদিকে হটমেইলের ব্যাপক জনপ্রিয়তা মাইক্রোসফটের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। যার ফলে ১৯৯৭-এর শেষ দিকে মাইক্রোসফট হটমেইলের স্বত্ব তাঁদের কাছে বিক্রি করার প্রস্তাব পাঠায়। তারা দশ মিলিয়ন ডলার মূল্য নির্ধারণ করে এর জন্য। কিন্তু এ প্রসত্মাব ভাটিয়া নাকচ করে দেন।

ভারতে তৈরী হবে সিলিকন ভ্যালীর আদলে সাবি ভাটিয়ার উদ্যোগে
শহর ন্যানো সিটি

এক সপ্তাহ পর মাইক্রোসফট আবার নতুন প্রস্তাব নিয়ে আসে। এভাবে দুই মাস চলতে থাকে। কিন্তু ভাটিয়া তার সিদ্ধামেত্ম অটল থাকেন। পরে মাইক্রোসফট ভাটিয়াকে রেডমন্ডে বিল গেটসের সঙ্গে দেখা করার আমন্ত্রণ জানায়। ভাটিয়া বিল গেটসের সঙ্গে দেখা করেন। বিল গেটস অতি সাধারণভাবেই তার সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁকে চিন্তা-ভাবনা করে একটি মূল্য জানাতে বলেন। হটমেইলের মূল্য কতো হলে ভাটিয়া সেটি বিক্রি করতে পারেন এ জন্যই তিনি সবার মধ্যে একটি জরিপ চালান। ডগ কালিয়ম নামে একজন ভাটিয়ার সঙ্গে এই বলে বাজি ধরেন, তিনি ২০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি দিয়ে যদি মাইক্রোসফটের কাছে হটমেইল কোম্পানি বিক্রি করতে পারেন তবে তিনি ভাটিয়ার একটি মুর্তি তার বাসার সামনে তৈরি করে দেবেন ব্রোঞ্জ দিয়ে। ভাটিয়া মাইক্রোসফটের কাছে অর্ধেক বিলিয়ন ডলার দাবি করেন। এটি শুনে মাইক্রোসফটের এ প্রস্তাবকে হেসেই উড়িয়ে দেন। কিন্তু ভাটিয়া তাঁর সিদ্ধামেত্ম অনড়। মাইক্রোসফটও হাল ছেড়ে না দিয়ে ভাটিয়াকে একের পর এক প্রস্তাব দিতে থাকেন। অবশেষে ১৯৯৭ সালের শেষের দিকে ভাটিয়া ৪০০ মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে বিল গেটসের কাছে তাঁর হটমেইল কোম্পানিটি হস্তান্তর করেন।ডগ কার্লিস তার বাজির কথা মতো স্থাপত্য বানানোর জন্য লসএঞ্জেলস থেকে এক আর্কিটেক্টকে ঠিক করেন। কিমত্ম ভাটিয়া তাকে বারণ করেন। কারণ তাঁর মা তাকে বলেন, ভারতে কেবল মাহাত্মা গান্ধীই এতো সম্মান পাওয়ার যোগ্য।

মাইক্রোসফটের সাবডিভিশন হটমেইল কোম্পানির শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা হিসেবে ভাটিয়া তার চাকরি করতে থাকেন। হটমেইলের বর্তমান সদস্য সংখ্যা প্রায় ১.২ বিলিয়ন। প্রতিদিনই এর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।হটমেইলের ক্রমোন্নতি দেখে স্টিভ জারভেটসন নামে একজন কম্পিউটারবিদ ভাটিয়াকে পরে বলেন, এক বিলিয়ন ডলারও হয়তো বা এটি বিক্রির জন্য যথেষ্ট ছিল না। হটমেইলের এ সৃষ্টিকর্তা সাবির ভাটিয়া ১৯৯৯ সালের মার্চ মাসে মাইক্রোসফটের চাকরি ছেড়ে দিয়ে নতুন একটি ওয়েবসাইট শুরু করেন। তার এই নতুন উদ্যোগের লক্ষ্য সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষের মধ্যে একটি নেটওয়ার্ক স্থাপন করা। এর পাশাপাশি দিল্লীর অদূরে সিলিকন ভ্যালীর আদলে সাবির ভাটিয়ার উদ্যোগে তৈরী হচ্ছে নতুন শহর ন্যানো সিটি। [3]

সহায়ক রেফারেন্স:

১. উইকিপিডিয়া http://en.wikipedia.org

২. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ, টেক আইকন BDNews24.com

৩. মুহম্মদ খান, টেক আইকন BDNews24.com

৪. আলোচিত কম্পিটার বিজ্ঞানীদের ব্যক্তিগত ওয়েবসাইটসমূহ

- infolab.stanford.edu/~sergey/
- www.stallman.org/
- www.cs.helsinki.fi/u/torvalds/
- www.apple.com/pr/bios/jobs.html
- www.woz.org/
- www.oracle.com/corporate/pressroom/html/ellisonl.html
- infolab.stanford.edu/~page/
- www.microsoft.com/BillGates/
- www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/
- www.edge.org/3rd_culture/bios/krause.html
- plan9.bell-labs.com/who/ken/
- cm.bell-labs.com/who/dmr/
- www.research.att.com/~bs/
- www.cs.berkeley.edu/~zadeh/
- www.anitaborg.org/
- www.turing.org.uk/turing/
- www.intel.com/pressroom/kits/bios/barrett/bio.htm
- www.indobase.com/indians-abroad/sabeer-bhatia.html

৫. মোঃ আলমগীর এর ব্লগ http://www.sachalayatan.com/alamgir

৬. বিপ রঞ্জন ধর এর ব্লগ, blog.biprodhar.com/